এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(প্রথম খন্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্-গায্যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমর গ্রন্থ যেমন এক সময় পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গাযযালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাহ্গণের মতই তাঁরও জীবনযাত্রা ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বচ্ছ আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে হাতে পাওয়া সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি তাড়িত হয়েই ইমাম সাহেব একদিন পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি

অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান- যাঁদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গাযযালীর ভাবশিষ্য, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

ভূমিকা

সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা করছি, যদিও তাঁর অপার মহিমা ও প্রতিপত্তির সামনে সকল প্রশংসাকারীর যাবতীয় প্রশংসাই নিতান্ত তুচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক উপাধিতে ভূষিত রসূল শ্রেষ্ঠ (সাঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তৃতীয়তঃ এলমে দ্বীনকে জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে একখানা গ্রন্থ রচনার যে ইচ্ছা আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য তৌফীক কামনা করছি। চতুর্থতঃ হে নিন্দুক ও গাফেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অন্যতম, অধিকতর অস্বীকৃতি ও নিন্দা জ্ঞাপনকারী! তোমার আত্মম্ভরিতার অবসান কামনা করি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আমার জবান থেকে নীরবতার গিঁঠ তুলে নিয়েছেন এবং আমার গলায় কথা ও যুক্তির মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে সে কথা বলতে হল যাতে তুমি নিরত। অর্থাৎ, ন্যায় ও সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে অন্যায়ের সহায়তা ও মূর্খতার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করছ। যদি কোন লোক সৃষ্টির নিয়ম নীতি থেকে সামান্যও সরে আসতে চায়, কিংবা নীতির অনুবর্তিতা পরিহার করে জ্ঞানানুসারে কাজ করতে আগ্রহী হয় এমন আশায় যে, নফসের পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহ যে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, তা হাসিল করতে পারবে এবং সারাটা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার প্রতিকারে যত্নবান হবে। যেসব আলেম সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন তাদের সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তক হযরতে ফখরুল মুরসালীন (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه ـ

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন সে আলেমই সর্বাধিক কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেমের কোন উপকারিতা দান করেননি।

তুমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দাও, অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অস্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ির কারণ তোমার এ রোগ ছাড়া আর কিছু নয় যা অধিকাংশ লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে; বরং বলা যায়, সারা বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ, আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য অবলোকনে মানুষ দিন দিন অপারগ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতেই পারছে না বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও অভিযান বিরাট। আখেরাত ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু নিকটবর্তী এবং যাত্রা দীর্ঘ। পাথেয় অল্প অথচ প্রয়োজন বিপুল। পথও বন্ধ। আর যে জ্ঞান ও কর্ম আল্লাহর অস্তিত্বের বাইরে, তা পর্যালোচক বুদ্ধির সামনে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। বহুবিধ ধ্বংসাত্মক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আখেরাতের পথচলা কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এ পথের পথপ্রদর্শক সেসব আলেমই হতে পারেন যাঁরা নবী-রসূলগণের যথার্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। অথচ দুনিয়া এসব লোক থেকে শূন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রথাগত লোকই রয়ে গেছে। আবার এদেরও বেশীর ভাগের উপরই শয়তান প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ঔদ্ধত্য তাদেরকে পথহারা করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের সাময়িক লাভের পেছনে পড়ে আছে। এ কারণেই তারা অধিকাংশ ভাল বিষয়কে মন্দ ও মন্দ বিষয়কে ভাল বিবেচনা করে। এমনকি দ্বীনী এলেম পুরানো হয়ে গেছে, হেদায়েতের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। তারা মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এলেম হয় হবে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ ইতর-চন্ডালদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহায্য গ্রহণ করে, আর না হয় হবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিদ্যা, যাতে করে দাম্ভিক অহংকারীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদেরকে বিজয়ী করার উপায় বানাবে। অথবা এলেম হবে সেসব ছন্দপূর্ণ মসৃণ সংলাপ, যেগুলো ওয়ায়েযরা সাধারণ মানুষকে পদস্খলিত করার অবলম্বন সাব্যস্ত করবে। কারণ, এই তিন প্রকার এলেম ছাড়া তারা হারাম এবং দুনিয়াদারদের মালামাল আয়ত্ত করার আর কোন ফাঁদ খুঁজে পায়নি। পূর্ববর্তী নেক ও সৎ মানুষেরা আখেরাতের যে পথে চলতেন, সে পথের জ্ঞান মানুষের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার নামগন্ধও আর নেই। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে জ্ঞানকেই তাঁর কিতাবে ফেকাহ, হেকমত, প্রজ্ঞা, আলো, জ্যোতি, হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু এ অবস্থা দ্বীনের উপর একটা বিরাট আঘাত ও মহাবিপদ, কাজেই আলোচ্য এ গ্রন্থ প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছি, যাতে করে দ্বীনের জ্ঞানসমূহ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, পরবর্তী পথপ্রদর্শকদের পথ সুগম হয় এবং নবী-রসূলগণ ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের কল্যাণকর জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। এ গ্রন্থটি আমি চার খন্ডে রচনা করেছি। প্রথম খন্ডে রয়েছে এবাদত-উপাসনা, ২য় খন্ডে স্বভাব-প্রকৃতি ও শিষ্টাচার, তৃতীয় খন্ডে ক্ষতিকর বিষয়াদি, অর্থাৎ, যেসব বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং চতুর্থ খন্ডে রয়েছে ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি। অর্থাৎ যেসব বিষয় নফসের কারাগারে বন্দীকে মুক্তি দান করবে। সর্বাগ্রে আমি জ্ঞান অধ্যায় এজন্য রচনা করছি যে, সেটি অত্যন্ত জরুরী। তা ছাড়া এ অধ্যায়টি সর্বাগ্রে সংযোজনের আরেকটি কারণ হল, যাতে প্রতিটি লোকের সামনে সে জ্ঞান বিকশিত হয়ে যায়, যা অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলে মকবুল (সঃ)-এর মাধ্যমে এবাদত হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা এ অধ্যায়ে মানুষের সঠিক পথ পরিহার করে মরীচিকার চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া এবং জ্ঞানের নির্যাস ফেলে তার ছাল-বাকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরব। এখন জানা প্রয়োজন, এ গ্রন্থের প্রতিটি খন্ড দশটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। অর্থাৎ, এবাদত খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস, পবিত্রতার তাৎপর্য, নামাযের তাৎপর্য, যাকাতের তাৎপর্য, রোযার তাৎপর্য, হজ্জের তাৎপর্য, কোরআন তেলাওয়াতের আদব, যিকির ও দোয়া এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ওজিফাদির নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কিত। আচরণ খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ (১) পানাহারের আদব (২) বিয়ে-শাদীর আদব (৩) উপার্জন সংক্রান্ত বিধি-বিধান (৪) হালাল-হারাম (৫) জনগণের সাথে লেনদেনের প্রকারভেদ ও আদব (৬) নির্জনবাস (৭) সফর বা ভ্রমণের আদব (৮) সংগীত শ্রবণ ও আচ্ছন্নতা (৯) সদুপদেশ দান ও অসৎ বিষয় থেকে বারণ (১০) জীবনের শিষ্টাচার ও নবুয়তী স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কিত।

তৃতীয় খন্ড ধ্বংসাত্মক বিষয়সম্বলিত, যথা- (১) আত্মার বিস্ময় (২) আধ্যাত্মিক সাধনা (৩) ভোজন বিলাসিতা ও লজ্জাস্থানের বিপদাপদ (৪) জিহ্বার অনিষ্টকারিতা (৫) ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের অপকারিতা (৬) পৃথিবীর অনিষ্ট (৭) সম্পদ ও কার্পণ্যের নিন্দা (৮) ভুয়া মর্যাদা বোধ ও

লোকদেখানোর নিন্দা (৯) অহংকার ও আত্মপ্রশস্তির নিন্দা (১০) ধন-সম্পদের লোভ-লালসার নিন্দা প্রভৃতি সংক্রান্ত দশটি অধ্যায় সংযোজিত। আর চতুর্থ মুক্তি বিষয়ক খন্ডটিও তেমনি- (১) তওবা (২) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা (৩) আশা ও ভয় (৪) দারিদ্র্য প্রীতি ও দুনিয়া পরিহার (৫) আল্লাহর একত্ব ও তাঁর উপর নির্ভরশীলতা (৬) প্রেম, আগ্রহ, সম্পর্ক ও সম্মতি (৭) নিয়ত, নিষ্ঠা ও সততা (৮) অনুধ্যান ও আত্মসমালোচনা অর্থাৎ, রিপুর প্রতি সতর্ক পর্যবেক্ষণ (৯) মনন ও (১০) মৃত্যুর স্মরণ সংক্রান্ত ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এবাদত খন্ডে আমরা এবাদতের অন্তর্নিহিত আদব ও তার সুন্নতসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি, সেগুলোর সেসব গোপন তাৎপর্যসমূহ তুলে ধরব যেগুলোর প্রতি এবাদতকারী ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং যারা এসব বিষয় অবগত নয়, তারা আখেরাতের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ এ বিষয় প্রায়শই ফেকাহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বর্জিত হয়েছে এবং কেউই এগুলো লিপিবদ্ধ করেননি।

আচরণ খন্ডে আমরা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত আচার-আচরণের তাৎপর্য তুলে ধরব। সাথে সাথে আমরা সেগুলোর পন্থাসমূহের সূক্ষ্মতা এবং ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করব। কারণ, এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি দ্বীনদারেরই রয়েছে। অতঃপর ধ্বংস খণ্ডে সেসব বিষয় চিহ্নিত করব যেগুলো পরিহার করা অপরিহার্য। আত্মা এবং হৃদয়কে এগুলো থেকে পবিত্র মুক্ত করার কথা কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সেসব অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করব এবং অতঃপর সেসব বিষয় উল্লেখ করব যার কারণে মানুষের মধ্যে সে অভ্যাসগুলোর জন্ম হয়। প্রসঙ্গতঃ আমরা এসব অভ্যাসের ফলে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো তুলে ধরব। তারপর আমরা এসব অভ্যাসের লক্ষণাদি এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথাযথ প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে মানুষ তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

সবশেষে মুক্তি খণ্ডে সেসমস্ত কল্যাণ, আচরণ ও সৎস্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করব, যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যা নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্বভাব এবং আল্লাহ্ তাআলার নেকট্য লাভ করতে আগ্রহী বান্দারা যার মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা এসব স্বভাবের সংজ্ঞা, তাৎপর্য, তা অর্জনের উপায়, এর ফলাফল ও লক্ষণাদি এবং এর সেসব ফযীলত মাহাত্ম্য শরীয়ত ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি সহকারে আলোচনা করব। অবশ্য এসব বিষয়ে লোকেরা পুস্তকাদিও লেখেছে। তবে আমার এ পুস্তক তাদের রচনা থেকে পাঁচটি ব্যাপারে স্বতন্ত্র : (১) যে বিষয়টি তারা সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য ভেবে ছেড়ে দিয়েছে তা আমি সবিস্তার ব্যাখ্যাসহ লেখেছি। (২) যে বিষয়গুলো তারা বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে লেখেছে, আমি সেগুলো ধারাবাহিক ও বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছি। (৩) যে বিষয়গুলো তারা সুদীর্ঘ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছে, আমি সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করেছি। (৪) তারা যেসব বিষয় বারংবার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি বর্জন করেছি; শুধু তার মূল উদ্দেশ্যটি রেখেছি। (৫) আমি সেসব বিষয়গুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি, যেগুলো অনুধাবন করা (সাধারণ) জ্ঞানের পক্ষে কঠিন, অথচ এসবে এতদসংক্রান্ত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে সবাই প্রায় একই রকম লেখেছে। অথচ এমনও হতে পারে যে, এসব গোপন বিষয়ে একজন অবগত হবেন, কিন্তু তাঁর আরেক সতীর্থ অবগত হবেন না কিংবা এ সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি, কিন্তু পুস্তকে তা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছেন। অথবা ভুলেনওনি, কিন্তু আসল তাৎপর্য লেখার ব্যাপারে তাঁর কোন অন্তরায় থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে সেই সমুদয় তাৎপর্যের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। আর আমরা যে একে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি, তারও দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এই বিন্যাস, গবেষণা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটিই ছিল অপরিহার্য। কারণ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, তা দুই প্রকার। একটি হল 'এলমে মোয়ামালা' তথা বৈষয়িক জ্ঞান আর দ্বিতীয়টি 'এলমে মোকাশাফা। 'এলমে মোকাশাফা' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে জ্ঞান, যার কাছে জানা বিষয়টির বিকাশ দাবী করা যেতে পারে। আর এলমে মোয়ামালাহ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে এলেম, যার মাধ্যমে বিকশিত এলেমের উপর আমল করা যায়। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল এলমে মোয়ামালাহ, এলমে মোকাশাফা' নয়- যা কোন কিতাব বা গ্রন্থে লেখার অনুমতি নেই। বস্তুতঃ মা'রেফতান্বেষী ও সিদ্দীকগণের উচ্চতর মর্তবা-মর্যাদাই হল 'এলমে মোকাশাফা' অর্জন করতে পারা। পক্ষান্তরে এলমে মোয়ামালা' হল তা লাভের উপায় বা অবলম্বন। কিন্তু নবী রসূলগণ মানুষের সাথে শুধুমাত্র 'এলমে মোয়ামালা' সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন- এলমে মোকাশাফার ব্যাপারে কোন

আলোচনা করেননি। তবে উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে শুধু এর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত-ইশারা দিয়েছেন এ কারণে যে, তাঁরা জানতেন, সৃষ্টির কোন বাস্তব রূপ নেই।

অতঃপর এলমে মোয়ামালা দু'রকম। এক বাহ্যিক এলেম। অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা কাজকর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান। দুই– অন্তরের ক্রিয়াকর্মের জ্ঞান। যে এলেম বা জ্ঞান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিফলিত হয়, সেগুলো হয় হবে এবাদত-উপাসনা, না হয় হবে আচার-অভ্যাস। পক্ষান্তরে বাতেন বা গোপন– যা অন্তরের বা রিপুর অভ্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাও ভাল কিংবা মন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত। কাজেই মোট দাঁড়ালো চার ভাগে। এলমে মোয়ামালার কোন বিষয়ই এই বিভাগসমূহের বহির্ভূত নয়। আরেকটি কারণ, আমি শিক্ষার্থীদের সত্যিকার আগ্রহ সে ফেকাহর মধ্যেই দেখেছি, যা এমন লোকদের কাছে রক্ষিত, আল্লাহর প্রতি যাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং যা গর্ব-অহংকারের উপায় হতে পারে অথবা যার উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। আর সে ফেকাহ্ও চার প্রকার। যেহেতু প্রিয় বস্তু-সামগ্রীর প্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রীও প্রিয় বলে গণ্য হয়, সেহেতু আমিও এ ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করিনি। এ গ্রন্থটির আকৃতিও ফেকাহ গ্রন্থেরই অনুরূপ করেছি, যাতে করে মনের আকর্ষণ এদিকে বৃদ্ধি পায়। আর একই কারণে কোন কোন লোক, যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিত্তবানদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে আগ্রহী, তারা নিজেদের গ্রন্থকে নক্ষত্রের পঞ্জিকার আকারে ছক ও সংখ্যার ভিত্তিতে লেখেছেন এবং সেগুলোর নামকরণও করেছেন, 'স্বাস্থ্য-পঞ্জি' ধরনের। কারণ, বিত্তবানরা সাধারণতঃ এমনি ব্যাপারে বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এই রচনারীতিও তাদের মনোবৃত্তি সেসব পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট করবে। বলাই বাহুল্য, কারো মন সে এলেমের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এমন কলা-কৌশল অবলম্বন করা, যাতে চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ বিদ্যমান, সে কলা-কৌশলের তুলনায় অত্যন্ত জরুরী, যাতে শুধু দৈহিক চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কারণ, এলমে আখেরাতের ফল হল অন্তরাত্মার চিকিৎসা করা, যাতে করে একটা জীবন অনন্ত স্থায়িত্বে পৌঁছাতে পারে। পক্ষান্তরে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান সে পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছাতে পারবে, যাতে শুধু দৈহিক রোগ-ব্যাধিরই প্রতিকার হয়। আর একথাও নিশ্চিত, সেটি সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই যাওয়া-আসা করে। এবার আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তৌফীক ও পথ প্রদর্শনের আবেদন করছি। কারণ, তিনিই মহান দাতা। অতঃপর এলেম অধ্যায় গ্রন্থের শুরুতেই লেখছি।

সূচীপত্র

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান, জানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্ম্য

কোরআন মজীদে জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এই ঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۔

ফেরেশতাকুল ও মধ্যপন্থী আলেমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পর্যায়ে নিজের সত্তা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেরেশতাকুল এবং তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও মৌলিকতা বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ আরও বলেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۔

যারা বিশ্বাসী এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্তবা অনেক উঁচু করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন– সাধারণ মুমিনদের মর্তবা অপেক্ষা জ্ঞানী মুমিনদের মর্তবা সাতশ'স্তর বেশী হবে এবং প্রত্যেক দু'স্তরের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের সমান।

আল্লাহ পাক আরও বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, তারা কি সমান হতে পারে?"

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ـ

"বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে।"

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ـ

বলে দিন, আল্লাহ এবং কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানীরা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতারূপে যথেষ্ট।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ ـ

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল ঃ আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

এতে ব্যক্ত করা হয়েছে সে লোকটি জ্ঞানের বলেই রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

"যারা জ্ঞানী ছিল, তারা বলল ঃ তোমাদের ধ্বংস হোক, আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণই বিশ্বাসী ও সৎকর্মীর জন্য উত্তম।"

এতে বলা হয়েছে, পরকালের মাহাত্ম্য শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ـ

"আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি। এগুলো কেবল তারাই বুঝে, যারা জ্ঞানী।"

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ـ

"যদি তারা বিষয়টি রসূলের কাছে এবং গণ্যমান্যদের কাছে উপস্থাপন করত, তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানান্বেষী, তারা জেনে নিতে পারত।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে তাঁর নিজের বিধান শিক্ষিতদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্র বিধান জানার ব্যাপারে তাদের মর্তবাকে পয়গম্বরগণের মর্তবার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, আর নাযিল করেছি পশম এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক, এটা সর্বোত্তম।

এ আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে পোশাকের অর্থ শিক্ষা, পশমের অর্থ বিশ্বাস এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক বলে লজ্জা বুঝানো হয়েছে।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ ـ

"আমি তাদের কাছে কিতাব পৌঁছে দিয়েছি, যা জ্ঞান সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি।"

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ـ

"আমি সজ্ঞানে তাদের সকল অবস্থা বর্ণনা করব।"

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ـ

"বরং এগুলো কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের বক্ষে গচ্ছিত।"

خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।" এ বিষয়টি অনুগ্রহ প্রকাশের স্থলে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده .

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের প্রজ্ঞা দান করেন এবং তার অন্তরে সৎপথ ইলহাম করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ العلماء ورثة الانبياء "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী।"

বলাবাহুল্য, নবুওয়তের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। কাজেই এ মর্তবার উত্তরাধিকারী হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন গৌরবও নেই। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু মাগফেরাত প্রার্থনা করে। সুতরাং এর চেয়ে বড় আর কি পদমর্যাদা হবে, যার কারণে আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল মাগফেরাতের দোয়ায় মশগুল থাকবে? জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকে, আর ফেরেশতারা তার জন্যে মাগফেরাত প্রার্থনায় নিরত থাকেন। রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ "প্রজ্ঞা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে এবং গোলামের মর্যাদাও এত উঁচু করে যে, তাকে রাজা-বাদশাহদের আসনে বসিয়ে দেয়।" এ হাদীসে তিনি দুনিয়াতে জ্ঞানের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আখেরাত দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خصلتان لا يكونا فى منافق حسن سمت وفقه فى الدين .

"দুটি স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে পাওয়া যায় না। -(১) সুন্দর পথ প্রদর্শন এবং (২) ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।" কোন কোন সমসাময়িক ধর্ম জ্ঞানীর নেফাক (কপটতা) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত

নয়। কেননা, "ফেকাহ্" শব্দ বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই বুঝাননি, যা তোমরা মনে কর; বরং এ শব্দের অর্থ পরে বর্ণিত হবে। ফেকাহবিদের সর্বনিম্ন স্তর হল আখেরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস ফেকাহ্‌বিদের মধ্যে সুষ্ঠু ও প্রবল হয়ে গেলে সে নেফাক ও নাম-যশের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন ঃ "মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ঈমানদার সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যার কাছে মানুষ প্রয়োজন নিয়ে আগমন করলে সে তাদের উপকার করে এবং মানুষ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করলে সে নিজেকে বিমুখ করে দেয়।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "ঈমান নিরাভরণ। তার পোশাক হচ্ছে তাকওয়া (খোদাভীতি), তার মজ্জা হচ্ছে লজ্জা এবং তার ফল হচ্ছে জ্ঞান।" এক হাদীসে আছে ঃ মানুষের মধ্যে নবুওয়তের মর্তবার নিকটতম হচ্ছে জ্ঞানী ও জেহাদকারী সম্প্রদায়। জ্ঞানী সম্প্রদায় এ কারণে যে, তারা মানুষকে রসূলুল্লাহ (সঃ) কতৃর্ক আনীত কথাবার্তা বলে এবং জেহাদকারীগণ এ কারণে যে, তারা পয়গম্বরগণের আনীত শরীয়তের জন্যে অশ্বের সাহায্যে জেহাদ করে। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "একটি গোষ্ঠীর মরে যাওয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মরে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلنَّاسُ مَعْدِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا .

"মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত খনি বিশেষ। অতএব যারা জাহেলিয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলাম যুগেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।" এক হাদীসে আছে ঃ "কেয়ামতের দিন জ্ঞানীদের লেখার কালি শহীদদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের যেব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করবে, সে কিয়ামতের দিন ফেকাহবিদ ও জ্ঞানীরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।" অন্যত্র আছে ঃ যেব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করবে, আল্লাহ্ তাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবেন এবং তাকে ধারণাতীত জায়গা থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবেন।" আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, "হে ইবরাহীম! আমি মহাজ্ঞানী এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে পছন্দ করি।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে,

যারা ঠিক হয়ে গেলে সকল মানুষ ঠিক হয়ে যায় এবং যারা বিগড়ে গেলে সকল মানুষ বিগড়ে যায়। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে শাসক এবং অপর শ্রেণী ফেকাহ্‌বিদ অর্থাৎ, দ্বীনী এলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।" অন্য হাদীসে আছে ঃ "আল্লাহ্‌র নৈকট্যশালী করে এমন জ্ঞান বেশী পরিমাণে না থাকার দিন যদি আমার উপর আসে, তবে সেদিনের সূর্যোদয় যেন আমার ভাগ্যে না জুটে।"

এবাদত ও শাহাদতের উপর জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠত্বদান প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِي ـ

"জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।"

লক্ষণীয়, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এলেমকে কেমন করে নবুওয়তের স্তরে রেখেছেন এবং জ্ঞানহীন কর্মের মর্তবা কেমন করে হ্রাস করেছেন। অথচ এবাদতকারী সদাসর্বদা যে এবাদত করে, তার জ্ঞান সে অবশ্যই রাখে। এ জ্ঞান না হলে এবাদত হবে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ـ

"আলেম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর তেমনি, যেমন চতুর্দশীর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির উপর হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

"কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে– পয়গম্বরগণ, অতঃপর জ্ঞানী লোকগণ, অতঃপর শহীদগণ।"

এ হাদীস দ্বারা জ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, এটা নবুওয়তের পরে এবং শাহাদতের অগ্রে। অথচ শাহাদতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কোন কিছুর মাধ্যমে ততটুকু সমৃদ্ধ হয় না, যতটুকু দ্বীনের জ্ঞানের মাধ্যমে হয়। একজন দ্বীনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজার এবাদতকারী অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফেকাহ্ (দ্বীনী জ্ঞান)।" আরও বলা হয়েছে ঃ "ঈমানদার আলেম ঈমানদার আবেদ অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক এবং বক্তার সংখ্যা কম। ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প এবং দাতার সংখ্যা অধিক। এমন যুগে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা আমল করা উত্তম। অতি সত্বর এমন যুগ আসবে, যখন জ্ঞানীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বক্তা হবে অধিক। দাতা কম হবে এবং ভিক্ষুক বেশী হবে। তখন জ্ঞান অর্জন হবে আমল অপেক্ষা উত্তম।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি ও এবাদতকারীর মধ্যে একশ' স্তরের ব্যবধান রয়েছে! প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছরে অতিক্রম করতে পারবে।" এক হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ্, কোন্ আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হল ঃ আমরা আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, আপনি এলেম সম্পর্কে বলছেন! তিনি বললেন ঃ এলেমের সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়।" এক হাদীসে আছে ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলেমদেরকে উঠাবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ "হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ! আমি তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান রেখেছিলাম, তা তোমাদেরকে কিছু জেনেই রেখেছিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান এজন্যে রাখিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম।" আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরাও এমনি আনজাম কামনা করি।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) কোমায়লকে বললেন, "হে কোমায়ল! জ্ঞান ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জ্ঞান তোমার হেফাযত করে, আর তুমি

ধন-সম্পদের হেফাযত কর। জ্ঞান শাসক আর ধন-সম্পদ শাসিত। ধন ব্যয় করলে হ্রাস পায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বেড়ে যায়।" তিনি আরও বলেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি রোযাদার, এবাদতকারী ও জেহাদকারী অপেক্ষা উত্তম। আলেম ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইসলামে এমন শূন্যতা দেখা দেয়, যা তার উত্তরসুরি ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না।" তাঁর কথিত একটি আরবী কবিতার অনুবাদ এরূপ ঃ

"সকল মানুষ আকার-আকৃতিতে একরূপ। সকলের পিতা আদম এবং সকলের মা হওয়া। তারা যদি মূল উপাদান নিয়ে গর্ব করতে চায়, তবে পানি ও মৃত্তিকা ব্যতীত তাদের মূল উপাদান আর কি? হাঁ, যার দেহে আলেমদের গর্বের আলখেল্লা আঁটা রয়েছে। কেননা, সে নিজে যেমন পথপ্রাপ্ত, তেমনি অপরেরও পথ-প্রদর্শক। সৌন্দর্যের বস্তু তার অর্জিত রয়েছে। এটাই মানুষের মর্যাদা। মূর্খরা সদা জ্ঞানীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তথাপি তুমি এমন জ্ঞান অর্জন কর, যদ্দ্বারা চিরঞ্জীব হতে পার। সকল মানুষ মৃত; কিন্তু জ্ঞানী চিরজীবী।

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে বেশী ইযযতের কোন বিষয় নেই। বাদশাহ জনগণের শাসক হয়ে থাকে এবং জ্ঞানীরা বাদশাহদের শাসক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-কে এলেম, ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি এলেম পছন্দ করেছিলেন। ফলে তাঁকে এলেমের সাথে ধন এবং রাজত্বও দান করা হয়েছিল। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ সংসারবিমুখ দরবেশ। প্রশ্ন হল ঃ নীচ কে? উত্তর হল ঃ "যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।" মোট কথা, জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে তিনি মানুষ বলেননি। কেননা, যে বৈশিষ্ট্য মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, তা হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ তখনই মানুষ বলে কথিত হবে যখন তার মধ্যে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ দিব্যমান থাকবে। মানুষের মর্যাদা দৈহিক শক্তির কারণে নয়। কেননা, উট তার চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী। মানুষের মর্যাদা বিশাল বপু হওয়ার কারণেও নয়। কেননা, হাতীর বপু তার চেয়ে অনেক বিশাল। তেমনি বীরত্বের কারণেও নয়। কেননা, হিংস্র জন্তুর বীরত্ব মানুষের

চেয়ে বড়। বরং একমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই মানুষ সম্ভ্রান্ত। জ্ঞানের জন্যই মানুষ সৃষ্টি। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ কেউ আমাকে বলুক, যেব্যক্তি এলেম পায়নি, সে কি পেয়েছে এবং যেব্যক্তি এলেম পেয়েছে, তার পাওয়ার আর কি বাকী আছে?

ফাতাহ্ মুসেলী বলেন ঃ রোগীকে রোজ রোজ খাদ্য, পানীয় ও ওষুধপত্র কিছু না দিলে সে কি মরে যাবে না? লোকেরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে মরে যাবে। তিনি বললেন ঃ আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। আত্মাকে তিন দিন এলেম ও জ্ঞান থেকে উপোস রাখলে সে মরে যায়। তাঁর এ উক্তি যথার্থ। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার খোরাক; এগুলোর মাধ্যমেই তার জীবন; যেমন দেহের খোরাক খাদ্য। যার জ্ঞান নেই, তার অন্তর রুগ্ন। মৃত্যু তার জন্যে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার আত্মার রোগ ও মৃত্যুর খবর রাখে না। দুনিয়ার মহব্বত ও কাজ কারবারে লেগে থাকার কারণে তার চেতনা লোপ পায়। যেমন ভয় ও নেশার আতিশয্যে জখমের ব্যথা অনুভূত হয় না; যদিও বাস্তবে ব্যথা থাকে। কিন্তু মৃত্যু যখন দুনিয়ার বোঝা ও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তখন সে আত্মার মৃত্যুর কথা জানতে পারে এবং পরিতাপ করে। অবশ্য তখন পরিতাপে কোন উপকার হয় না। ভীত ব্যক্তির ভয় অথবা মাতালের নেশা দূর হয়ে গেলে ভয় ও নেশার অবস্থায় তার যেসব জখম লাগে, সেগুলো সে হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকে। সত্য উদঘাটিত হওয়ার সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, এখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। মৃত্যু হলে জাগ্রত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ "জ্ঞানী লোকদের লেখার কালি এবং শহীদদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশী হবে।" হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞান অর্জন কর জ্ঞানকে তুলে নেয়ার পূর্বে। জ্ঞান তুলে নেয়ার অর্থ জ্ঞানী লোকদের মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তারা জ্ঞানী লোকদের মাহাত্ম্য দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞানী অবস্থায় পুনরুত্থিত করলেই ভাল হত। কেউ জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশে জ্ঞানচর্চা করা আমার মতে সারারাত জাগ্রত থেকে নফল এবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। এ বিষয়টিই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

"আয় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ইহকালে পুণ্য এবং পরকালে পুণ্য দান করুন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার পুণ্য জ্ঞান ও আরাধনা। পরকালের পুণ্যের অর্থ জান্নাত।

জনৈক দার্শনিককে কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বস্তু সঞ্চয় করা দরকার? উত্তর হল ঃ এমন বস্তু সঞ্চয় করা উচিত, যা তোমার নৌকা ডুবে গেলে তোমার সাথে সাঁতার কাটতে থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞানই হচ্ছে সঞ্চয়যোগ্য বস্তু। কারণ, দেহরূপী নৌকা মৃত্যুরূপী সলিলে সমাধিলাভ করলে পর এটাই সাথে থাকে।

অন্য একজন দার্শনিক বলেন ঃ "যেব্যক্তি প্রজ্ঞাকে নিজের লাগাম বানিয়ে নেয়, মানুষ তাকে ইমাম করে নেয়। যেব্যক্তি জ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করে, মানুষ তাকে ইযযত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ জ্ঞানের এক গৌরব এই যে, "একে কোন ব্যক্তির সাথে সামান্যতম ব্যাপারেও সম্পর্কযুক্ত করা হলে সে আনন্দিত হয়। উদাহরণতঃ যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে। পক্ষান্তরে সে এ বিষয়ের জ্ঞান রাখে না– একথা কাউকে বলা হলে সে দুঃখিত হয়।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞানব্রতী হও। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি মহব্বতের চাদর আছে। যেব্যক্তি কোন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাআলা সে চাদর তাকে পরিয়ে দেন। এরপর সে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলেও তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের তওফীক দান করা হয়। পুনরায় গোনাহ্ করলেও আল্লাহ্ তাকে এই তওফীক দান করেন। তৃতীয় বার গোনাহ্ করার পরও এরূপ করা হয়। এভাবে বার বার তওফীক দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার কাছ থেকে সে চাদরটি ছিনিয়ে না নেয়া, যদিও তার গোনাহ্ বৃদ্ধি পেতে পেতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে।"

আহ্নাফ (রহঃ) বলেন, "মনে হয় জ্ঞানীগণ সমগ্র ইয্যতের মালিক হয়ে যাবে। যে ইয্যত জ্ঞানের দ্বারা সুদৃঢ় না হয়, তার পরিণতি হয় লাঞ্ছনা।"

সালেম ইবনে আবী জা'দ বলেন ঃ "আমি ক্রীতদাস ছিলাম। প্রভু আমাকে তিন'শ দেরহামের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে আমি কি কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করব সে সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে জ্ঞানকে পেশা করে নিলাম। এরপর এক বছর অতীত না হতেই শহরের শাসক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম; কাছে আসতে দিলাম না।"

যুহরা ইবনে আবু বকর বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে ইরাকে জ্ঞান ব্রতী হতে চিঠি লেখলেন। তিনি লেখলেন– যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে জ্ঞান হবে তোমার ধন। আর যদি ধনাঢ্য হয়ে যাও, তবে জ্ঞান হবে অঙ্গসজ্জা।

হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন ঃ হে বৎস! জ্ঞানীদের কাছে বস। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানের নূর দ্বারা অন্তরকে জীবিত করেন, যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা মাটিকে শস্যশ্যামল করেন। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্যে পানিতে মাছ এবং শূন্যে পাখীরা পর্যন্ত ক্রন্দন করে। বাহ্যতঃ তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত থাকে।

জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য

এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّيْنِ ـ

"তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে?"

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"অতএব যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।"

হাদীস নিম্নরূপ ঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

"যেব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালাবেন।"

* ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্যে পাখা বিছিয়ে দেয়।

* একশ' রাকআত নফল নামায পড়া অপেক্ষা জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা উত্তম।

* জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা মানুষের জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।

* জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদিও তা চীনে থাকে; অর্থাৎ অনেক দূরে থাকে।

* জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান একটি ভাণ্ডার, যার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা । সুতরাং জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন কর। কেননা, এতে চার ব্যক্তি সওয়াব পায়- (১) প্রশ্নকারী (২) জ্ঞানী ব্যক্তি (৩) শ্রোতা এবং (৪) যে তাদের প্রতি মহব্বত রাখে।

* মূর্খ ব্যক্তি যেন তার মূর্খতা নিয়ে চুপ করে বসে না থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরও তার জ্ঞান নিয়ে চুপ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ, মূর্খতা দূর করার জন্যে প্রশ্ন করবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তার জওয়াব দিবে।

* হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জ্ঞান সংক্রান্ত মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া, হাজার রোগীর খবর নিতে যাওয়া এবং হাজার জানাযায় যোগদান অপেক্ষা উত্তম। কেউ আরজ করল ঃ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষাও কি উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জ্ঞান ব্যতীত কোরআন কি উপকার করে?

* ইসলামকে জীবিত করার উদ্দেশে জ্ঞান অন্বেষণকালে যেব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তার এবং পয়গম্বরগণের স্তর হবে এক।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি বর্ণিত হল ঃ

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি যখন জ্ঞান অর্জন করছিলাম, তখন হীন ছিলাম। এখন আমার কাছে লোকজন জ্ঞান লাভ করতে শুরু করলে সম্মানের অধিকারী হয়ে গেছি।

* ইবনে আবী মুলায়কা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সমতুল্য কাউকে দেখিনি। তাঁর মুখাকৃতি সর্বোত্তম, কথাবার্তা প্রাঞ্জল এবং ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞানবহ।

* ইবনে মোবারক বলেন ঃ আমার কাছে সেই ব্যক্তি আশ্চর্যজনক, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে না। কারণ, তার মন তাকে কোন মাহাত্ম্যের প্রতি আহ্বান করে না।

* জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ দু'ব্যক্তির প্রতি আমার মনে যে দয়ার উদ্রেক হয়, তা অন্য কারও প্রতি হয় না- এক, সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে; কিন্তু বুঝে না এবং দুই, সে ব্যক্তি, যে বুঝে; কিন্তু অন্বেষণ করে না।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার মতে সারা রাত জেগে নফল পড়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী কল্যাণে অংশীদার। অন্য সকলেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী হও অথবা জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কোন কিছু হয়ো না, তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

* হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হাজার রাত জাগরণকারী রোযাদার আবেদের মরে যাওয়া এমন জ্ঞানী ব্যক্তির তুলনায় কম, যে আল্লাহ্ তা'আলার হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা নফলের চেয়ে উত্তম।

* ইবনে আবদুল হাকাম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের কাছে পাঠাভ্যাসে রত ছিলাম। এমন সময় যোহরের সময় হল। আমি নামাযের জন্যে কিতাব বন্ধ করলে তিনি বললেন ঃ ওহে, যার জন্যে তুমি উঠেছ, সেটা এর চেয়ে উত্তম নয়, যাতে তুমি ছিলে। তবে নিয়ত দুরস্ত হওয়া শর্ত।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মনে করে, জ্ঞান অন্বেষণ করা জেহাদ নয়, সে বুদ্ধি বিবেচনায় অপক্ব।

জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব

এ সম্পর্কিত আয়াত এই ঃ

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

"এবং যাতে সতর্ক করে তাদের সম্প্রদায়কে, যখন তাদের কাছে ফিরে আসে, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা সংযমী হয়।"

এ আয়াতে সতর্ক করার অর্থ জ্ঞানদান ও পথ প্রদর্শন।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ـ

"যখন আল্লাহ কিতাবের অধিকারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন একে মানুষের জন্যে অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।"

এতে বলা হয়েছে, জ্ঞানের শিক্ষাদান ওয়াজেব।

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"এবং তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।"

এতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্ঞান গোপন করা হারাম। যেমন- সাক্ষ্য গোপন করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ـ

যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপিষ্ঠ।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَاۤ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

"তার চেয়ে সুন্দর কথা কার, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে!"

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"তোমার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানদান করে তার কাছ থেকে সে অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়েছেন; অর্থাৎ, তারা অবশ্যই তা বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় বললেন ঃ

لَاَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

"যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি লোককেও পথ প্রদর্শন করেন, তবে এটা হবে তোমার জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।"

* যেব্যক্তি অন্যদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিক্ষা করবে, তাকে অবশ্যই পয়গম্বর ও সিদ্দীকের সওয়াব দান করা হবে।

* হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাদান করে, সে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে মহান বলে বিবেচিত হয়।

* কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবাদতকারী ও জেহাদকারীদেরকে বলবেন ঃ জান্নাতে যাও। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন ঃ ইলাহী! তারা আমাদের জ্ঞানের বদৌলতে এবাদত ও জেহাদ করেছে; অর্থাৎ সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমরা। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা আমার কাছে আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য। তোমরা সুপারিশ কর। তোমাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর তারা সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ মর্তবা সে জ্ঞানের, যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে অপরের কাছে পৌঁছায়। সে জ্ঞানের নয়, যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত থাকে এবং অন্যের কাছে পৌঁছায় না।

* রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ اَنْ يُّؤْتِيَهُمْ اِيَّاهُ وَلٰكِنْ يَّذْهَبُ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ

فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ اِلَّا رُؤُسَاءُ جُهَّالًا اِنْ سُئِلُوْا اَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّوْنَ يُضِلُّوْنَ۔

"আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দান করার পর তা ছিনিয়ে নিয়ে যান না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানও তুলে নেন। সেমতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার সাথে জ্ঞানও চলে যায়। অবশেষে মূর্খ নেতৃবর্গ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এই মূর্খদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা না জেনে না শুনে ফতোয়া দেয়। ফলে নিজেরাও বিপথগামী হয় এবং অপরকেও বিপথগামী করে।

مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ اَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ۔

যেব্যক্তি কোন জ্ঞান অর্জন করে, অতঃপর তা গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

* উৎকৃষ্ট দান ও উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে জ্ঞানের কথা, যা তুমি শুনে স্মরণ রাখবে, এরপর মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে এবং তাকে শিক্ষা দেবে। এটা এক বছর এবাদতের সমান।

* বলা হয়েছে ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَّا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَمَا وَالَاهُ اَوْ مُعَلِّمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا۔

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু তাতে রয়েছে, তাও অভিশপ্ত; কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং যা এর নিকটবর্তী হয় অথবা শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী, এগুলো অভিশপ্ত নয়।

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَمَلَائِكَتَهُ وَاَهْلَ سَمٰوَاتِهِ وَاَرْضِهِ حَتّٰى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتّٰى الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ۔

নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি পিপীলিকা তাদের গর্তে এবং মৎস্য সমুদ্রে সেই শিক্ষকের জন্যে রহমত কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।

* এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দোয়ার চাইতে বড় কোন উপকার করতে পারে না।

* যদি ঈমানদার একটি উত্তম কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে, তবে তার জন্যে তা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

* একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে দু'টি মজলিস দেখলেন। এক মজলিসে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছিল এবং মজলিসের লোকেরা দোয়ার প্রতিই উৎসুক ছিল। অপর মজলিসে শিক্ষাদান করা হচ্ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ প্রথম মজলিসের লোকেরা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দেবেন এবং ইচ্ছা না করলে দেবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় মজলিসের লোকেরা শিক্ষাদানে রত আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও শিক্ষাদাতারূপেই প্রেরণ করেছেন। এই বলে তিনি দ্বিতীয় মজলিসের দিকে গেলেন এবং তাদের মধ্যে বসে পড়লেন।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَاً۔

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কোন ভূখণ্ডে পতিত প্রচুর বৃষ্টির মত। সে ভূখণ্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি ধারণ করে এবং প্রচুর ঘাস উৎপন্ন করে। অপর অংশ এমন যে, সে পানি আটকে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আটকে পড়া সে পানি দ্বারা মানুষকে উপকার পৌছান। তারা তা পান করে এবং

ক্ষেতে সেচ করে। পক্ষান্তরে সে ভূখন্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি আটকায় না এবং ঘাস, লতাপাতাও উৎপন্ন করে না।”

এ হাদীসে ভূখন্ডের প্রথম অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা জ্ঞানের দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা অপরকে উপকার পৌঁছায় এবং তৃতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা উভয় বিষয় থেকে বঞ্চিত।

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهٖ وَصَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَّوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهٗ بِالْخَيْرِ ـ

মানুষ মারা গেলে তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি বিষয় অব্যাহত থাকে– (১) জ্ঞান- যা দ্বারা অপরের উপকার হয়, (২) সদকায়ে জারিয়া এবং (৩) সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্যে নেক দোয়া করে।

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ ـ

* সৎ কাজের প্রতি যে উৎসাহ দেয়, সে সৎকর্মীর অনুরূপ।

لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهٗ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِى الْخَيْرِ ـ

* দু'ব্যক্তির প্রতিই ঈর্ষা করা উচিত– (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন; অতঃপর সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দিয়েছেন এবং তা দান-খয়রাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেছেন।

* আমার নায়েবদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার নায়েব কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার পথ বেছে নেয় এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।

শিক্ষাদানের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি ঃ

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে সেসব লোকের সমান সওয়াব পাবে, যারা সে কাজটি সম্পাদন করবে।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা শেখায়, তার জন্যে সকল বস্তু, এমনকি সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত এস্তেগফার করে।

* জনৈক আলেম বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ।

* বর্ণিত আছে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) আসকালানে এসে কিছু দিন অবস্থান করেন। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তিনি বললেন ঃ আমার জন্যে সওয়ারী ঠিক করে দাও, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। এ শহরে জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটবে। এ কথা বলার কারণ, তিনি শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান অব্যাহত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন।

* আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি কাঁদছেন। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করে না।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানীরা কালের প্রদীপ। স্ব স্ব সময়ে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল বাতি বিশেষ। সমসাময়িক লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে আলো আহরণ করে।

* হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম সম্প্রদায় না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যেত। অর্থাৎ, জ্ঞানীরা জ্ঞানদানের মাধ্যমে মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে বের করে মানবতার স্তরে পৌঁছে দেয়।

* ইকরিমা বলেন ঃ এ জ্ঞানের কিছু মূল্য আছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ তা এই যে, তা এমন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে, যে স্মরণ রাখে এবং বিনষ্ট না করে।

* ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আলেমগণ উম্মতের প্রতি পিতামাতার চেয়ে অধিক দয়াশীল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ পিতামাতা মানুষকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করে, আর আলেমগণ রক্ষা করেন আখেরাতের আগুন থেকে।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানের সূচনা চুপ থাকা, অতঃপর শ্রবণ করা, অতঃপর মুখস্থ করা, অতঃপর আমল করা, অতঃপর মানুষের মধ্যে প্রচার করা।

* অন্য একজন বলেন ঃ নিজের জ্ঞান এমন ব্যক্তিকে দাও যে সে সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ কর, যে তুমি

যা জান না তা জানে। এরূপ করলে তুমি যা জান না, তা জানতে পারবে এবং যা জানবে তা মনে থাকবে।

* হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ আমি এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত পেয়েছি যে, জ্ঞান অর্জন কর। কারণ, জ্ঞানার্জন করা খোদাভীতি, তার অন্বেষণ এবাদত, তার পাঠদান তসবীহ্ এবং তার আলোচনা জেহাদ। যেব্যক্তি জানে না, তাকে জ্ঞানদান করা খয়রাত। যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তা ব্যয় করা নৈকট্য। জ্ঞান একাকীত্বে সহচর, সফরে সঙ্গী, একান্তে বাক্যালাপকারী, ধর্মের পথপ্রদর্শক, সচ্ছলতা ও নিঃস্বতা উভয় অবস্থায় পথপ্রদর্শক, বন্ধুদের সামনে প্রতিনিধিত্বকারী, অপরিচিতদের মধ্যে নৈকট্যকারী, শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার এবং জান্নাতের পথে আলোকবর্তিকা। এ জ্ঞানের বদৌলত আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোককে উচ্চ মর্তবা দান করেন। তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সর্দার, নেতা ও পথপ্রদর্শক করেন। তাদের দেখাদেখি অন্যরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। মানুষ তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি তাকিয়ে থাকে। ফেরেশতারা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং পাখা দ্বারা তাদেরকে মুছে পরিষ্কার করে। প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সবাই তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি, সমুদ্রের মৎস্য, পোকামাকড়, স্থলের হিংস্র সরীসৃপ ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু এবং আকাশ ও তারকারাজি পর্যন্ত মাগফেরাতের দোয়া করে। কারণ, জ্ঞান আত্মার জন্য জীবনী শক্তি। এর কারণে মূর্খতা থাকে না। জ্ঞান একটি নূর। এটি যার মধ্যে থাকে তার সামনে থেকে অন্ধকার সরে যায়। জ্ঞানের দ্বারা দেহ শক্তি পায় এবং দুর্বলতা দূরীভূত হয়। এর সাহায্যে বান্দা সৎলোকদের মর্তবা ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা রোযা রাখার সমান এবং জ্ঞানদানে মশগুল থাকা রাত জেগে নফল এবাদত করার সমান। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য, একত্বে বিশ্বাস ও এবাদত হয়। এর মাধ্যমেই পরহেযগারী, তাকওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং হালাল হারামের জ্ঞান অর্জিত হয়। জ্ঞান ইমাম এবং আমল তার অনুসারী। সৎলোকদের অন্তরেই এর জন্যে স্থান করা হয় এবং হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওফীকপ্রার্থী।

যে জ্ঞান ফরযে আইন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান অর্জন কর; যদিও তা চীন দেশে থাকে।

যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন, তা কি? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং এতে বিশটিরও বেশী মতের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা সবগুলোর বিবরণ দিচ্ছি না। তবে মতভেদের সারকথা প্রত্যেক পক্ষই সে জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক বলেছেন, যাতে সে নিজে নিয়োজিত ছিল। উদাহরণতঃ কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলেন, কালাম শাস্ত্রই ফরযে আইন। কারণ, তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এর মাধ্যমেই জানা যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান এ শাস্ত্রের দ্বারাই অর্জিত হয়। ফেকাহ্বিদগণ বলেন, ফেকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা করা ফরযে আইন। কারণ, এর মাধ্যমে এবাদত, হালাল-হারাম এবং জায়েয না-জায়েয ও আদান-প্রদান সম্পর্কে জানা যায়। তফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণ বলেন ঃ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নত শিক্ষা করা ফরযে আইন। কেননা, এ দু'টি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি। সূফীগণ বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে আমাদের জ্ঞান। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, বান্দার নিজের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদার অবস্থা জানা ফরযে আইন। কেউ বলেন ঃ এখলাস, নফসের অপবাদ এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফেরেশতাদের এলহামের পার্থক্য জানা ফরযে আইন। আবার কেউ বলেন, ফরযে আইন হচ্ছে 'এলমে বাতেন', যা এ জ্ঞানের যোগ্য বিশেষ লোকদের উপর ওয়াজেব। তাঁরা শব্দের ব্যাপকতা পরিবর্তন করে একে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে সে জ্ঞান, যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله الخ

পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ঃ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই----------।

কেননা, এ পাঁচটি বিষয়ই ওয়াজেব। তাই এগুলো জানাও ওয়াজেব।

এখন শিক্ষার্থীর পক্ষে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা দরকার, তা আমরা উল্লেখ করছি। আমরা এ অধ্যায়ের ভূমিকায় বলে এসেছি যে, এলেম দুই প্রকার (১) এলমে মোয়ামালা ও (২) এলমে মোকাশাফা। হাদীসে যে এলেম প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বলে ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে এলমে মোয়ামালা তথা আদান-প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান। বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তিন প্রকার বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়- (১) বিশ্বাস, (২) বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা ও (৩) না করা। এখন ধর, কোন ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হল। এখন তার উপর প্রথমতঃ ওয়াজেব হবে শাহাদতের উভয় কলেমা অর্থসহ শিক্ষা করা। অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কলেমাটি শেখা ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ওয়াজেব হবে। এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে বিশ্বাস করা ওয়াজেব হবে না; বরং নিঃসন্দেহে ও দ্বিধাহীন চিত্তে কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এতটুকু জ্ঞান মাঝে মাঝে অনুসরণ ও শ্রবণের মাধ্যমেও অর্জিত হয়ে যায়- আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ ওয়াজেব না হওয়ার কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরবের লোকদের কাছ থেকে যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই কেবল সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন।

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়টুকু জেনে নিলেই তখনকার ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। তখন কলেমাদ্বয় শিক্ষা করা ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই তার জন্যে ফরযে আইন ছিল। এছাড়া অন্য কোন কিছু তার জন্যে জরুরী ছিল না। কারণ, সে যদি এই কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করার পর মারা যায়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দারূপেই মরবে, নাফরমানরূপে নয়।

কলেমার পর অন্য বিষয়সমূহ সাময়িক কারণাদির ভিত্তিতে তার উপর ওয়াজেব হয়। এগুলো প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য নয়। কেউ কেউ এগুলো থেকে আলাদাও থাকতে পারে। এসব সাময়িক কারণ কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে দেখা দেয়। প্রথমটির উদাহরণ এই- মনে কর, উপরোক্ত ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময় থেকে যোহর পর্যন্ত জীবিত

রইল। যোহরের সময় এলে তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে ওযু ও নামাযের মাসআলা শিক্ষা করা। অতএব এ ব্যক্তি বালেগ হওয়ার সময় সুস্থ থাকলে যদি সে সূর্য ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত কিছু না শেখে এবং এ সময়ের পর শিখতে শুরু করলে ঠিক সময়ে সব শেখে আমল করতে না পারে, তবে বলা যায় যে, ব্যহ্যতঃ সে জীবিত থাকবে বিধায় সময়ের পূর্বেই শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব। এ কথাও বলা যায়, জানা আমল করার জন্যে শর্ত। আমল ওয়াজেব হওয়ার পর সে আমল সম্পর্কে জানা ওয়াজেব হয়। সুতরাং প্রথম সময় থেকে শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়। অন্যান্য নামাযের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য।

এর পর যদি এ ব্যক্তি রমযান পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে রমযানের কারণে রোযা শিক্ষা করা তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে। অর্থাৎ, জানতে হবে যে, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার সময়। এ সময়ে রোযার নিয়ত করা এবং পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা জরুরী।

এখন যদি তার কাছে অর্থ-সম্পদ আসে অথবা বালেগ হওয়ার সময়ই অর্থ সম্পদ থাকে, তবে যাকাতের পরিমাণ জানা তার জন্যে অপরিহার্য হবে। কিন্তু তখনই অপরিহার্য হবে না; বরং বালেগ হওয়ার সময় থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর অপরিহার্য হবে। যদি তার কাছে উট ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে তবে কেবল উটের যাকাত জানাই জরুরী হবে। অন্যান্য মালের ক্ষেত্রে এরূপ বুঝা উচিত।

যদি তার উপর হজ্জের মাস আসে, তবে হজ্জের মাসআলা তখনই জানা জরুরী নয়। কেননা, হজ্জ সমগ্র জীবৎকালের মধ্যে মাত্র একবার আদায় করতে হয়। তবে আলেমগণের উচিত তার সামর্থ্য থাকলে বলে দেয়া যে, জীবনে একবার হজ্জ করা সে ব্যক্তির উপর ফরয, যে পাথেয় ও সওয়ারীর মালিক। এতে সম্ভবতঃ সে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী মনে করে দ্রুত হজ্জ আদায় করতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর যখন সে হজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তখন মাসআলা শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব হবে। তবে কেবল হজ্জের আরকান ও ওয়াজেব বিষয়সমূহ শিক্ষা করা জরুরী হবে- নফলসমূহ নয়। কারণ, যে কাজ করা নফল, তা শিক্ষা করাও নফল। মোট কথা, যেসব করণীয় কাজ ফরযে আইন, সেগুলো শিক্ষা করা ক্রমান্বয়ে এমনিভাবে ওয়াজেব হবে। বর্জনীয় কর্মের ক্ষেত্রেও যখন যেরূপ অবস্থা দেখা দেবে, সেভাবেই তা শিক্ষা করা ওয়াজেব। এ বিষয়টি

মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ যেসব কথাবার্তা বলা হারাম, সেগুলো জানা বোবার জন্যে ওয়াজেব নয়; অথবা অবৈধ দৃষ্টির মাসআলা জানা অন্ধের জন্যে জরুরী নয় কিংবা যারা জঙ্গলে বাস করে, তাদের জন্যে কোন্ কোন্ গৃহে বসা হারাম, তা জানা আবশ্যক নয়। মোট কথা, যদি জানা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এসব বিষয়ের প্রয়োজন হবে না, তবে সেগুলো শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়; বরং যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত, সেগুলো সম্পর্কে বলে দেয়া জরুরী।

উদাহরণতঃ যদি মুসলমান হওয়ার সময় রেশমী বস্ত্র পরিহিত থাকে অথবা অবৈধভাবে দখল করা যমীনে বসে থাকে কিংবা বেগানা নারীর প্রতি তাকিয়ে থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় বর্জন করার কথা বলে দেয়া জরুরী। যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত নয়; বরং অদূর ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন পানাহারের বস্তু, সেগুলো শিক্ষা দেয়া ওয়াজেব। উদাহরণতঃ যদি কোন শহরে মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার প্রচলন থাকে, তবে তাকে এগুলো বর্জন করার কথা বলা জরুরী। যেসব বিষয় শিক্ষা করা ওয়াজেব, সেগুলো শেখানোও ওয়াজেব। বিশ্বাস এবং অন্তরের কর্মসমূহ জানাও আশংকা অনুযায়ী ওয়াজেব। যেমন, তার অন্তরে কলেমাদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলে তার এমন বিষয় শেখা উচিত, যদ্দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যদি সে সন্দেহ করে এবং মরে যায়; মৃত্যুর সময় সে বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ তা'আলার কালামে পাক অনন্ত, আল্লাহর দীদার সম্ভবপর, তার মধ্যে পরিবর্তনের অবকাশ নেই এবং এছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসও পোষণ করেনি, তবে এরূপ ব্যক্তি সকলের মতানুযায়ী ইসলামের উপরই মরেছে। কিন্তু যেসব কুমন্ত্রণা বিশ্বাসের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, সেগুলোর কতক স্বয়ং মানুষের মন থেকে উদগত হয় এবং কতক পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাব মনে উৎপন্ন হয়। যদি সে এমন শহরে বসবাস করে, যেখানে বেদআতী কথাবার্তার প্রচলন রয়েছে, তবে তাকে বালেগ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য বিষয় শিখিয়ে বেদআত থেকে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রথমেই মিথ্যা শিকড় গেড়ে না বসে। কেননা, মিথ্যা শ্রুতিগোচর হয়ে গেলে তা মন থেকে দূর করা ওয়াজেব হবে। অবশ্য কোন কোন সময় এটা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণতঃ নও-মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে এবং তার শহরে সুদের কারবার প্রচলিত থাকলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার মাসআলা শিক্ষা করা তার জন্যে ওয়াজেব হবে। অতএব ফরযে আইন শিক্ষা সম্পর্কে আমরা যা

লিপিবদ্ধ করেছি, তাই সত্য। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আমলের অবস্থা জানা ফরযে আইন। সুতরাং যেব্যক্তি প্রয়োজনীয় আমল ও তার ওয়াজেব হওয়ার সময় জেনে নেবে, সে তার ফরযে আইন জ্ঞান অর্জন করে নেবে। সূফীগণ বলেছেন, ফরযে আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ফেরেশতাদের ইলহাম জানা। তাদের এ উক্তিও সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তির জন্যে, যে এতে লিপ্ত হয়। মানুষ যেহেতু প্রায়ই অনিষ্টের কারণাদি তথা রিয়া ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে না, তাই তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্য থেকে যার প্রতি সে নিজেকে মুখাপেক্ষী দেখে, তা জানা তার জন্যে অপরিহার্য। এটা জানা অবশ্যই ওয়াজেব। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় মারাত্মক– (১) কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয়, (২) কুপ্রবৃত্তি, যা মেনে চলা হয় এবং (৩) আত্মম্ভরিতা। কোন মানুষ এগুলো থেকে মুক্ত নয়। পরে আমরা আড়ম্বর, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি মনের যেসব অবস্থা উল্লেখ করব, সে এ তিনটি মারাত্মক বিষয়েরই অনুসারী, যা দূর করা ফরযে আইন। এই মারাত্মক বিষয়সমূহের সংজ্ঞা, কারণাদি, লক্ষণ ও প্রতিকার না জানা পর্যন্ত এগুলো দূর করা সম্ভব নয়। কেননা, অনিষ্ট সম্পর্কে না জানার কারণেই মানুষ অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকার হচ্ছে বিপরীত বিষয় দ্বারা তার মোকাবিলা করা। পরবর্তীতে বিনাশন পর্বে আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি, তার অধিকাংশই ফরযে আইন। সব মানুষ অনর্থক বিষয়াদিতে মশগুল হওয়ার দিক দিয়ে সেগুলো বর্জন করে রেখেছে।

নও-মুসলিম ব্যক্তিকে বেহেশত, দোযখ, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় দ্রুত শিক্ষা দিতে হবে– যাতে সে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে। এ বিষয়টিও দুটি কলেমায়ে শাহাদতের পরিশিষ্ট। কারণ, রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাঁর আনীত বিষয়সমূহও বুঝা দরকার। তা এই যে, যেব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাত এবং যে তাঁদের নাফরমানী করে তার জন্য জাহান্নাম। সত্য মাযহাব এটাই এবং এ থেকে আরও জানা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির দিবারাত্রির চিন্তাধারার মধ্যে এবাদত ও আদান-প্রদানের কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। এ কারণেই তার সামনে যে অভিনব ঘটনা ঘটে, তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী এবং যে ঘটনা সত্বর ঘটবে বলে আশা করা যায়, অবিলম্বে তার জ্ঞান লাভ করাও জরুরী।

সুতরাং জানা গেল, طلب العلم فريضة على كل مسلم বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে আমলের এলেমই বুঝিয়েছেন, যার ওয়াজেব হওয়া সুস্পষ্ট, অন্য কোন এলেম বুঝাননি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, আমল ওয়াজেব হওয়ার সময় ক্রমান্বয়ে এলেম ওয়াজেব হতে থাকবে। والله اعلم

যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া

প্রকাশ থাকে যে, শিক্ষার প্রকারসমূহ উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন্‌টি ফরয এবং কোন্‌টি ফরয নয়– এর পার্থক্য বুঝা যাবে না। ফরযে কেফায়ার দিক দিয়ে জ্ঞান দু'রকম– শরীয়তগত ও শরীয়ত বহির্ভূত। পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় এবং বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও শ্রবণ দ্বারা অর্জিত হয় না, তাকে আমরা শরীয়তগত জ্ঞান বলে থাকি। যেমন, অংক শাস্ত্র বুদ্ধি দ্বারা, চিকিৎসা শাস্ত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং অভিধান শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জিত হয়। যে জ্ঞান শরীয়তগত নয়, তা তিন প্রকার– ভাল, মন্দ, অনুমোদিত। যে জ্ঞানের সাথে পার্থিব বিষয়াদির উপযোগিতা জড়িত, তা ভাল জ্ঞান; যেমন চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্র! এ শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে কতক ফরযে কেফায়া এবং কতক শুধু ভাল– ফরয নয়। পার্থিব বিষয়াদিতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা ফরযে কেফায়া। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র। দেহের সুস্থতার জন্যে এটা জরুরী। লেনদেন, ওসিয়ত, উত্তরাধিকার বন্টন ইত্যাদিতে অংক শাস্ত্র জরুরী। শহরে কোন ব্যক্তি এ জ্ঞানের অধিকারী না থাকলে শহরবাসীর অসুবিধার অন্ত থাকবে না। কিন্তু অংক শাস্ত্রে একজন জ্ঞানী হলেও যথেষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা এ ফরয থেকে অব্যাহতি পায়। আমরা চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান ফরয বলেছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এদিক দিয়ে মৌলিক শিল্পগুলোও ফরযে কেফায়া। উদাহরণতঃ বস্ত্র বয়ন, কৃষিকাজ এবং রাজনীতি প্রভৃতিও ফরযে কেফায়া। বরং বদরক্ত চুষে বের করা এবং সেলাই কর্ম শিক্ষা করাও জরুরী। কোন শহরে বদরক্ত বের করার লোক না থাকলে শহরবাসীর জীবন বিপন্ন হবে। যে আল্লাহ রোগ প্রেরণ করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন এবং ব্যবহার পদ্ধতিও নির্দেশ করেছেন। এভাবে তিনি রোগমুক্তির উপকরণ ঠিক করে দিয়েছেন। সুতরাং এসব উপকরণ কাজে না লাগিয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া বৈধ নয়। যে জ্ঞান ফরয নয়, কেবল ভাল, যেমন অংক ও চিকিৎসার

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হয় না। শরীয়ত বহির্ভূত জ্ঞানের মধ্যে মন্দ শিক্ষা, যেমন জাদু ও তেলেসমাতের জ্ঞান, আর অনুমোদিত অর্থাৎ, বৈধ জ্ঞান যেমন, ক্ষতিকর নয় এমন কবিতা এবং ইতিহাসের জ্ঞান। এখানে শরীয়তগত জ্ঞান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান সবই ভাল। কিন্তু বাস্তবে মন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা শরীয়তগত জ্ঞান জানায় ধোঁকা হয় বিধায় এ জ্ঞান দু'রকম– ভাল ও মন্দ। ভাল জ্ঞানের কিছু অংশ মৌলিক, কিছু অংশ শাখা, কিছু অংশ ভূমিকা এবং কিছু অংশ পরিশিষ্ট। অর্থাৎ, এ জ্ঞানের চারটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম মৌলিক । এ মৌলিক জ্ঞান চারটি–

(১) আল্লাহর কিতাব, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত, (৩) উম্মতের ইজমা এবং (৪) সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্য। ইজমা যেহেতু সুন্নতকে জানার সুযোগ করে দেয়, তাই এটা মৌলিক জ্ঞান। কিন্তু এর মর্যাদা সুন্নতের পর। সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্যও সুন্নত জ্ঞাপন করে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা এমন সব বিষয় দেখেছেন যা অন্যের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। তাই আলেমগণ তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের ঐতিহ্যগুলোকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা যথার্থ মনে করেছেন।

শরীয়তগত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে শাখা, যা এই চারটি মৌলিক জ্ঞান থেকে বুঝা যায়, শব্দাবলী থেকে বুঝা যায় না; বরং অর্থ সম্ভার ও কারণাদির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উদাহরণতঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ لايقضى القاضى وهو غضبان বিচারক ক্রুদ্ধ অবস্থায় কোন রায় দেবে না। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, যখন বিচারকের উপর প্রস্রাবের চাপ থাকে, অথবা সে ক্ষুধার্ত থাকে অথবা রোগ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, তখনও রায় দেবে না।

এই শাখা জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত– (১) পার্থিব কল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। কল্যাণের সাথে ফেকাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দায়িত্বে রয়েছেন ফেকাহ্‌বিদগণ। তাঁরা পার্থিব আলেম। (২) আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মনের অবস্থা এবং তার ভাল ও মন্দ অভ্যাসের জ্ঞান। এসব অভ্যাসের মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় আর কোন্‌টি অপছন্দনীয়, তাও জানতে হয়। এ গ্রন্থের শেষার্ধে এ জ্ঞানের বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

শরীয়তগত জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ভূমিকা, যা শরীয়তগত জ্ঞানের হাতিয়ারস্বরূপ। যেমন, অভিধান ও ব্যাকরণ উভয়টিই কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার। অথচ অভিধান ও ব্যাকরণ শরীয়তগত জ্ঞান নয়। কিন্তু শরীয়ত জানার জন্যে এগুলো নিয়ে গবেষণা করা অপরিহার্য। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শরীয়ত আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক শরীয়তের অবস্থা তার ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। তাই আরবী অভিধানের জ্ঞানার্জন কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের জন্য হাতিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে। পুথিগত জ্ঞানও এ হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা জরুরী নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মী ছিলেন; পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। যদি ধরে নেয়া যায়, শ্রুত কথাবার্তা স্মরণ রাখা সম্ভবপর, তবে লেখা শেখার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু প্রায়শঃ মানুষ এরূপ হয় না বিধায় অক্ষর জ্ঞান জরুরী।

শরীয়তী জ্ঞানের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে পরিশিষ্ট। এটা কোরআন মজীদে রয়েছে। কারণ, এর কতক অংশ শব্দাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কেরাত ও অক্ষরের মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থল প্রভৃতির জ্ঞানার্জন। আবার এর কয়েকটি অর্থের সাথে সম্পৃক্ত– যেমন, তফসীর। এ জ্ঞানও কোরআন হাদীসের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেবল অভিধানের জ্ঞান এর জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও কতক অংশ কোরআনের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, নাসেখ, মনসুখ এবং আম ও খাস ইত্যাদির জ্ঞান। এ জ্ঞানকে 'উসূলে ফেকাহ্' তথা ফেকাহ্র মূলনীতি বলা হয়। হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনায় রাবীদের নাম, বংশ পরিচয় ও অন্যান্য অবস্থা জানা, সাহাবীদের নাম ও গুণাবলী জানা, যাতে দুর্বল হাদীসকে শক্তিশালী হাদীস থেকে পৃথক করা যায়। রাবীদের বয়সের অবস্থা জানা, যাতে মুরসাল হাদীস মুসনাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এমনি ধরনের সকল বিষয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তগত জ্ঞানের উপরোক্ত প্রকার চতুষ্টয় কল্যাণকর এবং ফরযে কেফায়া। যদি প্রশ্ন হয়, উপরে ফেকাহ পার্থিব জ্ঞান এবং ফোকাহ্বিদগণকে পার্থিব আলেম বলা হল কেন? তবে জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করে পিতার ঔরস থেকে মাতার গর্ভে এবং সেখান থেকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ করেছেন। এরপর দুনিয়া থেকে

কবরে, কবর থেকে হিসাব-নিকাশের জন্যে হাশরে এবং সেখান থেকে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এগুলোই হচ্ছে মানুষের সূচনা এবং শেষ মনযিল ও শেষ পরিণতি। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে মানুষের জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র করেছেন, যাতে মানুষ উপার্জনযোগ্য বিষয়সমূহ এখানে উপার্জন করে নেয়। মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে ও ইনসাফ সহকারে দুনিয়াকে গ্রহণ করে, তবে সকল ঝগড়াই চুকে যায় এবং ফেকাহ্বিদগণের কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মানুষ তা করে না। সে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে দুনিয়াকে গ্রহণ করে। ফলে দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রাজা-বাদশাহ তথা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং আইন-কানুন রচনা করতে হয়েছে। ফেকাহ্বিদ শাসননীতি প্রণয়নে পারদর্শী এবং বিবাদ-বিসংবাদে মানুষের মধ্যে ইনসাফ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি শাসনকর্তাকে পথ প্রদর্শন করেন। হাঁ, দ্বীনের সাথেও ফেকাহ্র সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সরাসরি নয়– দুনিয়ার মধ্যস্থতায়। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র এবং দ্বীন দুনিয়া ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। রাজ্য শাসন ও দ্বীন উভয়েই যমজ অর্থাৎ এক সাথে থাকে। দ্বীন আসল এবং রাজ্য তার রক্ষক। বৃক্ষ যেমন শিকড় ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না, দ্বীনও তেমনি রক্ষক ব্যতীত কায়েম থাকে না। রাজ্য শাসন ও ব্যবস্থাপনা রাজা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা করার ব্যবস্থা ফেকাহ্র সাহায্যে হয়ে থাকে। সুতরাং রাজ্য শাসন যেমন প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়; বরং দ্বীনের পূর্ণতায় রাজ্য শাসন সহায়ক হয়ে থাকে, তেমনি রাজ্য শাসন পদ্ধতি অর্থাৎ ফেকাহ্র জ্ঞানলাভ করাও প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়। উদাহরণতঃ পথিমধ্যে বেদুইনদের কবল থেকে রক্ষা করে– এমন ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে হজ্জ পূর্ণ হয় না। কিন্তু হজ্জ এক বস্তু, হজ্জের পথে চলা দ্বিতীয় বস্তু, হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্যে পথের নিরাপত্তা তৃতীয় বস্তু এবং এর পদ্ধতি, কৌশল ও আইন-কানুন জানা চতুর্থ বস্তু। রাজ্য শাসন ও হেফাযতের পদ্ধতি শিক্ষা করা ফেকাহ্র সারকথা। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ ঃ

আমীর, মামুর ও মুতাকাল্লিফ– এ তিন শ্রেণী ব্যতীত যেন কেউ শাসনকার্য পরিচালনা না করে।

এ হাদীসে 'আমীর' বলে ইমাম তথা শাসককে বুঝানো হয়েছে। প্রথম যুগে শাসকই ফতোয়া দিতেন। 'মামুর' অর্থ ইমামের নায়েব এবং 'মুতাকাল্লিফ' অর্থ যে আমীরও নয় এবং মামুরও নয়। সে সেই ব্যক্তি, যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব পদ গ্রহণ করে। সাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল, তাঁরা ফতোয়া দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন এবং একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। কিন্তু কেউ কোরআন ও আখেরাতের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলে দিতেন। কতক রেওয়ায়েতে মুতাকাল্লিফ শব্দের স্থলে 'মুরায়ী' অর্থাৎ, রিয়াকার বর্ণিত আছে। কারণ, যেব্যক্তি ফতোয়া দানের পদ গ্রহণ করে, অথচ এ কাজের জন্যে একমাত্র সেই নির্দিষ্ট নয়, তার মতলব নাম যশ ও অর্থোপার্জন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বলা যেতে পারে, আপনার এ বক্তব্য হুদূদ ও কেসাসের বিধি-বিধানে এবং ক্ষতিপূরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিষয়বস্তু যেমন– নামায-রোযা ইত্যাদি এবাদত এবং হালাল হারাম কাজ-কারবারের বর্ণনা এ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে না। ফেকাহ্‌বিদগণ এসব বিষয়েও ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এর জওয়াব এই যে, ফেকাহ্‌বিদগণ আখেরাতের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেসব আমল বর্ণনা করেন, সেগুলো বেশীর চেয়ে বেশী তিন প্রকার হতে পারে– (১) ইসলাম, (২) নামায ও যাকাত এবং (৩) হালাল ও হারাম। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও ফেকাহ্‌বিদের চূড়ান্ত দৃষ্টি দুনিয়ার সীমা পার হয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয় না। এ তিন বিষয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অন্যান্য বিষয়ে তো দুনিয়ার মধ্যেই থাকবে। উদাহরণতঃ ইসলাম সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদ কিছু বললে একথাই বলবে যে, অমুকের ইসলাম সঠিক এবং অমুকের ইসলাম সঠিক নয়। মুসলমান হওয়ার শর্ত এগুলো কিন্তু এসব বর্ণনায় মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না। অন্তর তার রাজত্বের বাইরে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাজা বাদশাহদেরকে অন্তরের রাজত্ব থেকে পদচ্যুত করে দিয়েছেন। সেমতে জনৈক সাহাবী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যে মুখে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছিল। হত্যাকারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই বলে ওযর পেশ করলেন যে, লোকটি তরবারির ভয়ে কলেমা উচ্চারণ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ هلا شققت قلبه অর্থাৎ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে সে অন্তর দিয়ে বলছে কিনা? বরং ফেকাহবিদ ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া তরবারির ছায়াতলে দেয়। অথচ সে জানে, তরবারি দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়নি এবং অন্তরের উপর থেকে মূর্খতার পর্দা সরে যায়নি। যদি কোন ব্যক্তির ঘাড়ের উপর তরবারি উত্তোলিত থাকে এবং ধন-সম্পদের দিকে হাত প্রসারিত থাকে, এমতাবস্থায় সে কলেমা উচ্চারণ করলে ফেকাহ্‌বিদের ফতোয়া অনুযায়ী তার প্রাণ ও ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে। কলেমার দৌলতে তার জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم واموالهم -

"কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। যখন তারা এ কলেমা বলবে, তখন আমার কাছ থেকে তারা তাদের জান ও মাল বাঁচিয়ে নেবে।"

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল জান ও মালের উপর এ মৌখিক কলেমার প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আখেরাতে মৌখিক কথাবার্তা উপকারী নয়; বরং অন্তরের নূর, রহস্য ও চরিত্র উপকারী। এসব বিষয় ফেকাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কোন ফেকাহ্‌বিদ এগুলো বর্ণনা করলে তা কালাম ও চিকিৎসা শাস্ত্র বর্ণনা করার মতই হবে। তার এ বর্ণনা ফেকাহ্ শাস্ত্র বহির্ভূত।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বাহ্যিক সব শর্ত পূরণ করে নামায আদায় করে এবং প্রথম তকবীর ছাড়া সমস্ত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গাফেল থাকে; বরং বাজারের কাজকারবারের কথা চিন্তা করতে থাকে, তবে ফেকাহ্‌বিদ অবশ্যই ফতোয়া দেবেন যে, তার নামায সঠিক হয়েছে। অথচ এ নামায আখেরাতে তেমন উপকারী হবে না। যেমন, মুখে কেবল কলেমা উচ্চারণ করে নেয়া ইসলামের ব্যাপারে বিচার দিবসে উপকারী হবে না। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদ এই অর্থে ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া দেবেন যে, সে যা করছে তাতে আল্লাহ্‌র আদেশসূচক বাক্য পালিত হয়ে গেছে এবং হত্যা ও শাস্তি তার উপর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে! নামাযে খুশু খুযু, নম্রতা ও অন্তর হাযির করা, যা আখেরাতের কাজ, তা

নিয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ সচরাচর আলোচনা করেন না। করলেও তা ফেকাহ্‌ শাস্ত্র থেকে আলাদাই থাকবে।

যাকাতের ব্যাপারেও ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টি এতটুকুতেই নিবদ্ধ থাকে, যতটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে শাসনকর্তার দাবী পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এতটুকু হওয়া যে, যদি মালদার ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং শাসনকর্তা তাকে জবরদস্তি গ্রেফতার করে, তবে এ ফতোয়া যেন দেয়া যায় যে, তার যিম্মায় যাকাত নেই। বর্ণিত আছে, কাজী আবু ইউসুফ বছরের শেষ ভাগে নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীকে দান করে দিতেন এবং তার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ে নিজের নামে দান করিয়ে নিতেন, যাতে যাকাত ওয়াজেব না হয়। এ বিষয়টি কেউ হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা তার ফেকাহর ফল। ইমাম আবু হানীফার এ উক্তি যথার্থ। কেননা, এ কৌশল কেবল দুনিয়াবী ফেকাহ্‌রই হতে পারে। পরকালে এর ক্ষতি যেকোন গোনাহ থেকে বড়।

হালাল ও হারামের অবস্থা এই যে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার স্থির নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার চারটি স্তর রয়েছে– (১) সেই স্তর, যা সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে শর্ত। আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ সাক্ষ্য দেয়ার, বিচারক হওয়ার এবং শাসক হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বাহ্যিক হারাম থেকে বেঁচে থাকাই কেবল এ ধরনের আত্মরক্ষা। (২) সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আত্মরক্ষা; অর্থাৎ এমন সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যাতে হারাম ও হালাল হওয়ার উভয়বিধ সম্ভাবনাই বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ دع ما يريبك الى ما لا يريبك "যা সন্দেহজনক নয়, তার বিনিময়ে যা সন্দেহজনক তা ত্যাগ কর।" তিনি আরও বলেন ঃ الاثم حواز القلوب অর্থাৎ, গোনাহ অন্তরে খটকা লাগায়। (৩) মুত্তাকী-পরহেযগারদের আত্মরক্ষা– তারা কিছু সংখ্যক হালালকেও এ কারণে পরিহার করে যে, এর দ্বারা হারাম পর্যন্ত পৌঁছার ভয় থাকে।

لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به مخافة مما به باس -

"মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না, যে পর্যন্ত এমন বিষয় পরিহার না করে, যাতে কোন ক্ষতি নেই 'ক্ষতি হতে পারে' এমন বিষয়ে জড়িত হওয়ার ভয়ে।" এর উদাহরণ– যেমন, কোন ব্যক্তি গীবত হওয়ার ভয়ে অন্যের অবস্থা বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকে। অথবা উল্লাস স্ফূর্তি বেড়ে গিয়ে অবাধ্যতা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। (৪) সিদ্দীকগণের আত্মরক্ষা। তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত সবকিছু থেকে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেন জীবনের এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত না হয়, যাতে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য থেকে সামান্য সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও তাতে হারাম পর্যন্ত না পৌঁছার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে।

সুতরাং প্রথম স্তর ব্যতীত সকল স্তরই ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। তার দৃষ্টি কেবল সাক্ষীদের ও বিচারকদের হারাম থেকে আত্মরক্ষার দিকে থাকে এবং সেসব বিষয়ের দিকে থাকে, যেগুলো আদেল হওয়ার পরিপন্থী। এরূপ আত্মরক্ষার উপর কায়েম থাকা আখেরাতে গোনাহ্‌ হওয়ার পরিপন্থী নয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেন ঃ "তুমি তোমার অন্তরের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয়।"শেষ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদ অন্তরের খটকার কথা বর্ণনা করে না এবং খটকা সহকারে আমলের অবস্থাও বলে না; বরং কেবল এমন বিষয় বর্ণনা করে, যদ্দ্বারা ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

যাবতীয় বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ফেকাহ্‌বিদের পূর্ণ দৃষ্টি সে জগতের সাথে জড়িত, যার দ্বারা আখেরাতের পথ নিষ্কণ্টক হয়। সে অন্তরের হাল হকিকত ও আখেরাতের বিধানাবলী বললে তা একান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। যেমন, তার কথায় মাঝে মাঝে চিকিৎসা, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা ও কালাম শাস্ত্রের আলোচনাও এসে যায়। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন, ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের অন্বেষণ আখেরাতের পাথেয় নয়। এ উক্তি যথার্থ। কেননা, সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, তদনুযায়ী আমল করা। এমতাবস্থায় সেই জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন কানুনের জ্ঞান কিরূপে হতে পারে? এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হবে, এ আশায় যে লোক এসব বিষয় শিক্ষা করে সে উন্মাদ। আল্লাহর আনুগত্যে অন্তর ও

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা আমল হয়ে থাকে। এ আমলের জ্ঞানই সর্বোত্তম। এখানে প্রশ্ন হয়, আপনি ফেকাহ্ ও চিকিৎসা শাস্ত্রকে বরাবর করে দিলেন কিরূপে? চিকিৎসা শাস্ত্র দুনিয়া তথা দেহের সুস্থতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর উপরও দ্বীনের সঠিকতা নির্ভরশীল। এরূপ জ্ঞানকে ফেকাহর বরাবর করা ইজমার পরিপন্থী। এর জওয়াব এই যে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ফেকাহ্ বরাবর হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনটি কারণে ফেকাহ্ চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শ্রেষ্ঠ। প্রথমত ফেকাহ্ শরীয়তী জ্ঞান অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অর্জিত। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র শরীয়তী জ্ঞান নয়। দ্বিতীয়তঃ যারা আখেরাতের পথিক, তাদের কেউ ফেকাহ্র প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। রুগ্ন ও সুস্থ উভয়েরই এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি কেবল রুগ্নরাই মুখাপেক্ষী। তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ ফেকাহ্ শাস্ত্র আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গী। কারণ, এর সারকথা হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের প্রতি লক্ষ্য করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অন্তরের অভ্যাস। ভাল আমল ভাল অভ্যাস থেকে প্রকাশ পায় এবং মন্দ আমল মন্দ অভ্যাস থেকে উদগত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অপর দিকে সুস্থতা ও অসুস্থতার উৎপত্তি হয় মেযাজ ও পিত্তের দোষ-গুণ থেকে, যা দেহের বিশেষণসমূহের অন্যতম– অন্তরের নয়। সুতরাং ফেকাহকে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে দেখলে ফেকাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাবে এবং একে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্রের সাথে তুলনা করলে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্র মনে হবে।

আখেরাত বিষয়ক এলেম

উল্লেখ্য, আখেরাত বিষয়ক এলেম দুই প্রকার– এলমে মুকাশাফা ও এলমে মুয়ামালা। এলমে মুকাশাফার অপর নাম এলমে বাতেন। এটা সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেমতে জনৈক সাধক বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তার সমাপ্তি অকল্যাণকর হবে বলে আমি আশংকা করি। এ শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বনিম্ন জ্ঞান এই যে, একে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং যোগ্য লোকদের এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা স্বীকার করবে। অন্য একজন বলেন ঃ যার মধ্যে বেদআত ও আত্মম্ভরিতা রয়েছে, সে অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেও এই শাস্ত্রের

কোন বিষয় অর্জন করতে পারবে না। এ শাস্ত্র অস্বীকারকারীর সর্বনিম্ন শাস্তি এই যে, এ শাস্ত্র থেকে সে কিছুই লাভ করতে পারে না। এটা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল বান্দাদের শাস্ত্র। এটা একটা নূর। অন্তর যখন তার মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন এই নূর অন্তরে প্রকাশ পায়। এ নূরের প্রভাবে মানুষের সামনে রহস্যের বহু দ্বারোদঘাটিত হয়ে যায়। পূর্বে যেসব বিষয়ের কেবল নাম শুনত এবং কিছু অস্পষ্ট অর্থ ধারণা করে নিত, এ নূরের বরকতে এখন সেসবগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এমনকি, তখন আল্লাহ পাকের সত্তার প্রকৃত মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর, তাঁর কর্মের, দুনিয়া ও আখেরাতের সৃষ্টি রহস্যের এবং আখেরাতকে দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল করার বাস্তব মারেফত অর্জিত হয়ে যায়। নবুওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও শয়তানের অর্থ, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীগণ কর্তৃক ফেরেশতাগণকে জানার স্বরূপ, তাঁদের কাছে ওহী পৌছার অবস্থা, আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা, অন্তরের মারেফত, তার মধ্যে ফেরেশতা ও শয়তানের বাহিনীর মোকাবিলার অবস্থা, ফেরেশতাগণের ইলহাম ও শয়তানদের কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়, আখেরাত, জান্নাত, দোযখ. কবরের আযাব, পুলসেরাত, মীযান ও হিসাবের পরিচয়, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তত্ত্ব–

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا .

"তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে যথেষ্ট।"

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

"আখেরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।"

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল হওয়া ও প্রতিবেশী হওয়ার উদ্দেশ্য, উর্ধ্ব জগতের সঙ্গ এবং ফেরেশতাগণের নৈকট্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার মর্ম, জান্নাতীদের স্তরের মধ্যে এত পার্থক্য হওয়া যে, তারা একে অপরকে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মত ঝলমল করতে দেখবে– ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এ নূরের কারণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এ নূরের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মে মানুষ মতভেদ করে। মূল বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে ঠিক, কিন্তু আপন স্বার্থের ব্যাপারে কিসের মধ্যে কি বলতে থাকে! কতক লোকের বিশ্বাস- এগুলো সব দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা তার সৎ বান্দাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং কারও অন্তর কল্পনাও করেনি। মানুষের জন্যে জান্নাতে গুণাবলী ও নাম ছাড়া কিছু নেই। কারও বিশ্বাস- এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় দৃষ্টান্ত এবং কিছু বিষয় এমন, যার স্বরূপ শব্দ থেকে জানা যায়। কারও মতে, আল্লাহ তা'আলার মারেফতের পরিণতি ও পূর্ণতা, তাঁকে জানার ব্যাপারে অক্ষমতা স্বীকার করা। কিছু লোক আল্লাহ তা'আলার মারেফত সম্পর্কে বড় বড় দাবী করে। কেউ কেউ বলে, আল্লাহ তা'আলার মারেফতের চূড়ান্ত স্তর সর্বসাধারণের বিশ্বাসের সীমা; অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান, জ্ঞাত, ক্ষমতাশালী, শ্রোতা, দ্রষ্টা, বাক্যালাপকারী। এলমে মুকাশাফা বর্ণনা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য এসব বিষয়ের উপর থেকে পর্দা সরে যাওয়া, সত্য বিষয় চোখে দেখে নেয়ার মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এরপর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা। অন্তরের উপর পাপাচারের মরিচা থরে থরে পড়ে না থাকলে এটা মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

আখেরাতের এলেম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সেসব পাপাচার থেকে অন্তরের স্বচ্ছ হওয়ার অবস্থা জানা, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণ ও কর্মের স্বরূপ জানতে বাধা সৃষ্টি করে। অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং সর্বাবস্থায় পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। এ উপায় অবলম্বন করলে অন্তর পরিষ্কার হতে থাকবে, তাতে সত্যের অংশ প্রতিফলিত এবং সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে থাকবে। এ স্বচ্ছতার পথ রিয়াযত তথা সাধনা ও জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। সাধনার বিবরণ স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

এসব জ্ঞান কোন কিতাবে লিখিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা যাকে এ জ্ঞান সামান্য দান করেন, সে তা অন্যের কাছে সাধারণভাবে বর্ণনা করে না; কেবল যোগ্য সহচরের কাছেই বর্ণনা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ গোপন জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ কতক জ্ঞান লুক্কায়িত ধনভান্ডারের ন্যায়। সাধকবৃন্দ ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। তাঁরা এগুলো বললে কেবল সেসব লোকই এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে,

যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে আলেমকে এ জ্ঞানের কিছু অংশ দান করেন, তাঁকে হেয় মনে করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেয় করেননি এবং এ জ্ঞান দান করেছেন।

এলমে মুয়ামালা হচ্ছে অন্তরের ভালমন্দ অবস্থা জানা। ভাল অবস্থা যেমন- সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, খোদাভীতি, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্বীকার করা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, সচ্চরিত্রতা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, সততা, এগুলোর স্বরূপ জানা, এগুলো অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর মধ্যে কোনটি দুর্বল হয়ে গেলে তাকে শক্তিশালী করার উপায় জানা এবং কোনটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা সৃষ্টি করার পদ্ধতি আয়ত্ত করা আখেরাত বিষয়ক এলেমের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে অন্তরের মন্দ অবস্থা, যেমন দারিদ্র্যের ভয়, তকদীরের প্রতি অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ব অন্বেষণ, প্রশংসা কামনা, পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্যে দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ আস্ফালন, শত্রুতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, বিত্তবানদের সম্মান করা, ফকীরদেরকে হেয় করার প্রয়াস, কোন বিষয়ে একে অপরের উপর বড়াই করা, সত্য বিষয়ে অহমিকা করা, অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করা, বেশী কথা বলা পছন্দ করা, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সেজেগুজে থাকা, ধর্মের কাজে শৈথিল্য করা, নিজেকে বড় মনে করা, নফসের অনিষ্ট থেকে গাফেল হয়ে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা, নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত থাকা, অপমান বোধ করলে কঠোরভাবে তার প্রতিশোধ নেয়া, সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে দুর্বল হওয়া, আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া, এবাদতের উপর ভরসা করা, চক্রান্ত, আত্মসাৎ ও প্রতারণা করা কঠোর প্রাণ হওয়া, রূঢ়ভাষী হওয়া, দুনিয়া নিয়ে খুশী থাকা, পার্থিব সাফল্য না পেয়ে কাতর হওয়া, জুলুম করা, লজ্জা শরম ও দয়া কম হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই মন্দ। অন্তরের এসব অভ্যাস সকল অনিষ্ট ও কুকর্মের মূল। এর বিপরীত তথা ভাল অভ্যাসসমূহ আনুগত্য ও পুণ্যের মূল। এগুলোর সংজ্ঞা, স্বরূপ, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানার নাম আখেরাত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী এটি ফরযে আইন। যেব্যক্তি এ থেকে বিমুখ থাকবে, সে আখেরাতে সত্যিকার মহাসম্রাটের ক্রোধে

নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন, বাহ্যিক আমলের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী দুনিয়ার শাসনকর্তার তরবারি দ্বারা এবং ফেকাহ্‌বিদগণের ফতোয়া অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সারকথা, ফেকাহ্‌বিদগণ দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফরযে আইন বিষয়সমূহ দেখে থাকেন। আর আমরা যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করেছি, তা মানুষকে আখেরাতের কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। কোন ফেকাহবিদকে তাওয়াক্কুল অথবা এখলাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে অথবা রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে জওয়াবদানে বিরত থাকবে। অথচ এটা তার নিজের উপরও ফরযে আইন। এটা না জানলে তার পরকাল বিনষ্ট হবে। কিন্তু তাকে যদি লেয়ান, যেহার, ঘোড়দৌড় ও তীরন্দাজির মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সে এগুলোর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার বিরাট দফতর বর্ণনা করে দেবে, যেগুলোর প্রয়োজন শত শত বছর পর্যন্তও কারও হবে না। প্রয়োজন হলেও সেগুলোর বর্ণনাকারীর অভাব হবে না। ফেকাহ্‌বিদ দিবারাত্র এগুলোর স্মরণ ও পাঠদান করার মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু যে বিশেষ বিষয়টি তার জন্য জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি গাফেল থাকে। এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে সে বলে ঃ এটা দ্বীনী এলেম এবং ফরযে কেফায়া। তাই আমি এতে নিয়োজিত আছি। মানুষ এ ধোঁকায় পড়ে ফেকাহর জ্ঞনার্জন করে এবং অপরকে ধোঁকা দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানে, যদি ফরযে কেফায়ার হক আদায় করাই তার উদ্দেশ্য হত, তবে ফরযে কেফায়ার পূর্বে ফরযে আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করত। বস্তুতঃ ফরযে কেফায়া আরও অনেক রয়েছে। সেগুলো ফেকাহ্‌র পূর্বে অর্জন করত। কোন কোন শহরে কাফের যিম্মী ছাড়া মুসলমান চিকিৎসক নেই। ফেকাহর যেসকল বিধি-বিধান চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোতে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেকাহ্‌বিদ চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ফেকাহ্ শাস্ত্র বিশেষতঃ বিরোধপূর্ণ ও বিতর্কিত মাসআলাসমূহ শিক্ষা করার কাজে বাড়াবাড়ি করে। অথচ এ ধরনের ফতোয়াদান ও মোকদ্দমায় জওয়াব লেখার লোক শহরে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় যখন কিছু লোক এ ফরযে কেফায়া পালনে তৎপর রয়েছে, তখন ফেকাহ্‌বিদরা এটা শিক্ষা করার অনুমতি কিরূপে দেবে এবং যে চিকিৎসা শাস্ত্র কেউ জানে না, তা বর্জন করার আদেশ কিরূপে দেবে? এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের

জ্ঞানার্জনে ওয়াক্‌ফ ও ওসিয়তের মুতাওয়াল্লী হওয়া যায় না, এতীমদের ধনসম্পদের রক্ষক হওয়া যায় না, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগে চাকুরী লাভ করে সমকক্ষদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না এবং শত্রুদের উপর প্রবলও হওয়া যায় না।

পরিতাপের বিষয়, মন্দ আলেমদের ধোঁকায় দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এমন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং শয়তান খুশী হয়। বাহ্যদর্শী আলেমগণের মধ্যে যারা পরহেযগার ছিলেন, তাঁরা বাতেনী আলেম ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শায়বান নামক এক আবেদ রাখালের সামনে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতেন ঃ যেমন মক্তবে বালকরা ওস্তাদের সামনে বসে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ অমুক অমুক ব্যাপারে আমি কি করব? লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে বলত ঃ আপনার মত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এই জংলী লোকটির নিকট কি শিখতে পারেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা যা শেখনি, তার তওফীক এ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) মারূফ কারখীর কাছে যাতায়াত করতেন। অথচ তিনি যাহেরী এলেমে এঁদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁরা উভয়ই তাঁকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যদি কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই এবং কোরআন ও হাদীসে তার বিধান খুঁজে না পাই, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ সাধু পুরুষদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো। এ কারণেই বলা হয়েছে, বাহ্যিক আলেমগণ পৃথিবী ও দেশের শোভা এবং বাতেনী আলেমগণ আকাশ ও ফেরেশতাজগতের সৌন্দর্য। জুনাইদ (রহঃ) বলেন ঃ একদিন আমাকে আমার মুর্শিদ সিররী (রহঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে কার কাছে গিয়ে বস? আমি বললাম ঃ মুহাসেবী (রহঃ)-এর কাছে। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। তাঁর জ্ঞান ও আদব গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি যে কালাম শাস্ত্র ও মুসলিম দার্শনিকদের খণ্ডন করেন তা শেখো না। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে উঠার সময় একথা বলতে শুনলাম ঃ আল্লাহ্ তোমাকে এলেম ও হাদীসওয়ালা সূফী করুন– সূফী হাদীসওয়ালা না করুন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, যেব্যক্তি হাদীস ও এলেম শিখে সূফী হয়, সে সফলতা লাভ করে। আর যেব্যক্তি সূফী হয়ে হাদীস শিক্ষা করে, সে

নিজেকে বিপন্ন করে।

আমরা জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে কালাম শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিনি এবং এগুলো ভাল কি মন্দ তাও বর্ণনা করিনি। এর কারণ, কালাম শাস্ত্রের যে সকল উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোর সারমর্ম কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেসকল বিষয় কোরআন ও হাদীস বহির্ভূত, সেগুলো হয় বেদআতের অন্তর্ভুক্ত মন্দ বিবাদ বিসম্বাদ, না হয় বিভিন্ন ফেরকার বিরোধ সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃতি। সুতরাং এগুলো সব বাতিল ও অর্থহীন বিষয়। সুস্থ হৃদয় এগুলো দূষণীয় মনে করে এবং সত্যপন্থী কান এগুলো শ্রবণ করতে সম্মত নয়। আর কিছু বিষয় রয়েছে যা দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। তখন এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বেদআত বলে গণ্য হত। কিন্তু এখন নীতি বদলে গেছে। কারণ, এ ধরনের বেদআত অনেক হয়ে গেছে, যা কোরআন ও হাদীসের দাবীর প্রতি বিমুখ করে। এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা বেদআতের সন্দেহকে মসৃণ করেছে এবং এ সম্পর্কে বক্তৃতা রচনা করেছে। ফলে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রথমে নিষিদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের খাতিরে এখন জায়েয; বরং ফরযে কেফায়া হয়ে গেছে।

দর্শনশাস্ত্র কোন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং এর চারটি অংশ রয়েছে– (১) জ্যামিতি ও অংক। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এ উভয়টিই জায়েয। যার সম্পর্কে আশংকা হয় যে, এগুলো পাঠ করলে খারাপ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এগুলো পাঠ করতে নিষেধ করা যাবে না। যার সম্পর্কে আশংকা, তাকে নিষেধ করা দরকার। কারণ, এসব বিষয়ে অধিক পারদর্শী হলে মানুষ বেদআতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতএব যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে উভয় বিষয় পাঠ করা থেকে বাঁচানো উচিত। যেমন, ছোট শিশুকে নদীর কিনারে দাঁড়াতে দেয়া হয় না অথবা নও-মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করা থেকে দূরে রাখা হয়. যাতে তার উপর সংসর্গের প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয় অংশ ফালসাফা (দর্শন)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে প্রমাণের অবস্থা ও শর্ত এবং সংজ্ঞার কারণ ও শর্ত বর্ণিত হয়। উভয়টিই কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (৩) এলমে ইলাহিয়াত– অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা। এটাও কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিকরা এক্ষেত্রে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান আবিষ্কার

করেননি; বরং তাদের মাযহাব আলাদা। তন্মধ্যে কতক কুফর এবং কতক বেদআত। মুতাযেলী হয়ে যাওয়া যেমন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং কালাম শাস্ত্রীদেরই কতক লোক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে বাতিল মাযহাব সৃষ্টি করে নিয়েছে, দার্শনিকদের অবস্থাও তেমনি। (৪) পদার্থবিদ্যা– এর কতক অংশ শরীয়ত বিরোধী। এটা মূলতঃ জ্ঞানই নয় যে, জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা যাবে; বরং এটা মূর্খতা। আর কতক অংশে পদার্থের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং রূপান্তরণের বিষয় আলোচিত হয়। এর অবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রের মত। পার্থক্য এই যে, চিকিৎসকের দৃষ্টি রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়ে বিশেষভাবে মানব দেহের উপর নিবদ্ধ থাকে এবং পদার্থবিদদের দৃষ্টি পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন ও গতিশীলতার দিকে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থবিদ্যার তুলনায় উত্তম। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং পদার্থবিদ্যার তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

সারকথা, কালাম শাস্ত্র ফরযে কেফায়া জ্ঞানসমূহের অন্যতম। এর ফলে সর্বসাধারণের অন্তর বেদআতীদের চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পায়। বেদআত পয়দা হওয়ার কারণে এ শাস্ত্র ওয়াজেব হয়েছে। যেমন হজ্জের পথে বেদুঈনদের জুলুম ও রাহাজানির কারণে রক্ষীর আশ্রয় নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। যদি বেদুঈনরা তাদের অত্যাচার বন্ধ করে দেয়, তবে হজ্জের শর্তসমূহের মধ্যে সাহায্য গ্রহণ করার শর্ত বাদ পড়ে যাবে। অনুরূপ বেদআতীরা যদি তাদের বাজে বকা বন্ধ করে দেয়, তবে সাহাবায়ে কেরামের সময়ে যতটুকু ছিল, এর বেশী কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব কালাম শাস্ত্রীদের জানা উচিত, ধর্মে তাদের মর্তবা হজ্জের পথে রক্ষীদের মর্তবারই মত। যদি রক্ষী রক্ষা কাজ ছাড়া অন্য কিছু না করে, তবে সে হাজী হবে না। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করলেই কেবল হাজী হবে। এমনিভাবে যদি কালামশাস্ত্রী কেবল বিতর্ক ও বেদআত দমনেই মশগুল থাকে এবং আখেরাতের পথ অতিক্রম না করে, আত্মার উন্নতি ও সংশোধনে নিয়োজিত না হয়, তবে সে কখনও আলেমে দ্বীনগণের মধ্যে গণ্য হবে না। তার কাছে আকীদা অন্তর ও মুখের বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাঁ, সর্বসাধারণ থেকে তার তফাৎ এতটুকু হবে যে, সে বেদআতীদের সাথে লড়াই করতে পারে এবং সাধারণ লোকের হেফাযত করে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর সিফাত ও কর্ম এবং এলমে মুকাশাফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের পরিচয় কালাম শাস্ত্রের দ্বারা

অর্জিত হয় না। বরং এ শাস্ত্র যে এগুলোর অন্তরায় তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। একমাত্র মুজাহাদা তথা সাধনার দ্বারাই এসব বিষয় অর্জন করা যায়। মুজাহাদাকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতের মুখবন্ধ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"যারা আমার পথে সাধনা করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।"

এখন আমি কালামশাস্ত্রীর সংজ্ঞাও বর্ণনা করলাম যে, সে সর্বসাধারণের বিশ্বাসকে বেদআতীদের যুক্তিজট থেকে মুক্ত রাখে, যেমন রক্ষী হাজীদেরকে বেদুঈনদের লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করে। আমি ফেকাহবিদের সংজ্ঞা এই বর্ণনা করেছি যে, সে সেসব আইন জানে, যদ্দ্বারা বাদশাহ্ একে অপরের উপর সীমালংঘন দমন করতে পারে। ধর্ম শাস্ত্রের তুলনায় এই উভয় কাজ নিম্নস্তরের। অথচ গুণী আলেম বলে যাঁরা প্রসিদ্ধ, তাঁরা হলেন ফেকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রী। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি ধর্ম শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে এই আলেমগণকে নিম্নস্তরের বলেন কেন? তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ দেখে সত্যের পরিচয় লাভ করে, সে পথভ্রষ্টতার অরণ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে। প্রথমে সত্য জানা দরকার। এর পর মানুষ চেনা উচিত, যদি সে সত্য পথের পথিক হয়। আর যদি তুমি অনুসরণ করেই তুষ্ট থাক এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রসিদ্ধ স্তরের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, তবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও উচ্চ মর্তবা থেকে গাফেল হয়ো না। যাদের কথা তুমি বল, তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বীনের ব্যাপারে কেউ তাঁদের মত চলতে পারে না, এমনকি তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। অথচ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কালাম ও ফেকাহ শাস্ত্রের কারণে ছিল না; বরং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র ও তার পথ অবলম্বনের কারণে ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর ছিল, তা বেশী রোযা রাখা, বেশী নামায পড়া এবং বহু হাদীস রেওয়ায়েতের কারণে ছিল না, ফতোয়া দান ও কালাম শাস্ত্রের দিক দিয়েও ছিল না; বরং সে বিষয়ের দিক দিয়ে ছিল, যা তাঁর বক্ষে প্রবিষ্ট ছিল। তোমার সে রহস্যের অনুসন্ধানে আগ্রহী

হওয়া উচিত। এটাই উৎকৃষ্ট ও গুপ্ত ভান্ডার বিশেষ। যাকে সাধারণ লোকজন বড় মনে করে এবং সম্মান করে, তাকে পরিত্যাগ কর। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) হাজারো সাহাবী দুনিয়াতে রেখে গেছেন। তাঁরা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের প্রশংসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে করেছেন। তাঁদের কেউ কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। দশ জনের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছাড়া কেউ নিজেকে ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত করেননি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রধান সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ "অমুক শাসনকর্তার কাছে যাও। সে এ কাজ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছে। এ প্রশ্নটি তার কাছে রাখ।" এতে ইঙ্গিত ছিল, মোকদ্দমা ও বিধিবিধান সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন ঃ এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ তিরোহিত হয়ে গেছে। লোকেরা বলল ঃ আমাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনি একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ফতোয়া ও বিধানের এলেম নয়– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত এলেম উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কি কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বুঝিয়েছিলেন? যদি না বুঝিয়ে থাকেন, তবে তুমি সে এলেমের মারেফত হাসিল করতে আগ্রহ কর না কেন, যার দশ ভাগের নয় ভাগ হযরত ওমরের ওফাতের কারণে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল? অথচ হযরত ওমর (রাঃ) কালাম ও বিতর্কের দরজা বন্ধ করেন। কেউ তাঁর সামনে কোরআনের দু'আয়াতের পরস্পর বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি তাকে দোররা মারতেন এবং তার সাথে মেলামেশা করতে মানুষকে নিষেধ করে দিতেন।

আলেমদের মধ্যে ফেকাহবিদ কালামশাস্ত্রীরা সমধিক প্রসিদ্ধ– একথার জওয়াব এই যে, যে বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়, তা অন্য জিনিস। সেমতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল খেলাফতের দিক দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই রহস্যের কারণে যা তাঁর অন্তরে রক্ষিত ছিল। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল রাজনীতির কারণে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সে এলেমের দিক দিয়ে, যার দশ ভাগের নয় ভাগ তাঁর মৃত্যুর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর লক্ষ্য

ছিল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার ও স্নেহ মমতা। এদিক দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ছিল অনন্য । এ বিষয়টি তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। তাঁর অন্যান্য বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম তো অন্য লোকদের দ্বারাও সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল, যারা জাঁকজমক, সুখ্যাতি ও নামযশ প্রত্যাশী। মোট কথা, প্রসিদ্ধি ক্ষতিকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আর শ্রেষ্ঠত্ব গোপন বিষয়ের আওতাভুক্ত, যা কেউ অবগত হতে পারে না। অতএব ফেকাহ ও কালামবিদ যথাক্রমে শাসক ও বিচারকের ন্যায়। তারা কয়েক ধরনের। তাদের কেউ আপন এলেম ও ফতোয়া দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তরীকাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়; নামযশ ও সুখ্যাতি তাদের কাম্য হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তারা এলেম অনুযায়ী আমল করে এবং ফতোয়া ও দলীল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, প্রত্যেক এলেমই আমল, কিন্তু প্রত্যেক আমল এলেম নয়। চিকিৎসকও তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম। সে তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র জন্যে কাজ করে বিধায় সওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে যদি শাসনকর্তা জনগণের কাজকারবার আল্লাহর জন্যে করে, তবে সে আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও সওয়াবের যোগ্য হবে- ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার দিক দিয়ে নয়; বরং এমন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে, যার লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।

তিন প্রকার বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হতে পারে- (১) শুধু এলেম এবং তা হচ্ছে এলমে মুকাশাফা। (২) শুধু আমল; যেমন শাসনকর্তার ন্যায়বিচার করা এবং মানুষকে শৃংখলায় রাখা। (৩) এলেম ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত শাস্ত্রই হচ্ছে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র। এই শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ও আমেল উভয়টি হয়ে থাকে। এখন তুমি নিজেই পছন্দ কর কেয়ামতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, না আমেলদের, না উভয় দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? নিছক সুখ্যাতির অনুসরণ করার তুলনায় এ কাজটি তোমার জন্যে অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জনৈক কবি বলেন ঃ যা দেখ এবং শুন, তা ত্যাগ কর। সূর্য সামনে থাকতে শনি গ্রহের কি প্রয়োজন?

এখানে আমরা পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করছি। এতে জানা যাবে, যারা নিজেদেরকে তাঁদের মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা তাঁদের প্রতি জুলুম করে এবং কিয়ামতে তারাই হবে এই ফেকাহ্বিদগণের বড় দুশমন। কেননা, স্ব স্ব এলেম দ্বারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের অবস্থার মধ্যে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়েছে। সেমতে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাঁরা কেবল ফেকাহ্শাস্ত্রেই মশগুল ছিলেন না; বরং আধ্যাত্ম্য জ্ঞানেরও চর্চা করতেন। এটা ঠিক, এ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা কোন কিতাব লেখেননি এবং কাউকে এর সবকও দেননি। সাহাবায়ে কেরাম যে কারণে ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কে কোন কিতাব লেখেননি এবং দরস দেননি, সে একই কারণে ফেকাহ্বিদগণও তা করেননি। অথচ ফতোয়া শাস্ত্রে সব সাহাবীই এক একজন ফেকাহ্বিদ ছিলেন।

এখন আমরা ইসলামী ফেকাহর কিছু অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, আমরা যা কিছু লিখেছি তা পূর্ববর্তী ফেকাহ্বিদগণের প্রতি ভর্ৎসনা নয়; বরং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা, যারা তাঁদের অনুসরণ দাবী করে এবং নিজেদেরকে তাঁদের মতাবলম্বী বলে প্রকাশ করে, অথচ আমলে তাঁদের বিপরীত।

যাঁরা ফকীহগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং যাঁদের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী, তাঁরা হলেন পাঁচ জন- ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী (রহঃ)। তাঁদের প্রত্যেকেই এবাদত, সংসারত্যাগ, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, মানব কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ফেকাহ্ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা- এই পঞ্চ গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই পঞ্চ গুণের মধ্য থেকে বর্তমান যুগের ফেকাহবিদগণ মাত্র একটি গুণে তাঁদের অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন মাসআলার শাখাগত বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জন ও তা নিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন। অবশিষ্ট চারটি গুণ কেবল আখেরাতেরই যোগ্য। আর এই একটি গুণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যে হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্যে ঝুঁকে পড়েছে এবং এই একটিমাত্র গুণের কারণে তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে সামঞ্জস্য দাবী করে। জিজ্ঞাসা করি, কর্মকার কি

ফেরেশতাগণের অনুরূপ হতে পারে?

এখন আমরা উপরোক্ত ইমামগণের অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, চারটি গুণই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম গুণ অর্থাৎ, ফেকাহশাস্ত্রে দক্ষতা– এটা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে এবাদতকারী ছিলেন, একথা এই রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়– তিনি রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতেন, একভাগ এলেমের জন্যে, দ্বিতীয় ভাগ নামাযের জন্যে এবং তৃতীয় ভাগ নিদ্রার জন্যে। রবী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসে ষাট বার কোরআন খতম করতেন এবং তা নামাযেই খতম করতেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য বুয়ায়তী রমযানে প্রতিদিন এক খতম করতেন। হাসান কারাবেসী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর সাথে অনেকবার রাত্রি যাপন করেছি। তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। আমি দেখেছি, তিনি নামাযে পঞ্চাশ আয়াতের বেশী পড়তেন না। বেশী পড়লে একশ' আয়াত পড়তেন। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিজের জন্যে, সকল মুসলমানের জন্যে এবং ঈমানদারদের জন্যে সে রহমতের দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে আযাবের আয়াত পাঠ করার সময় নিজেকে এবং মুসলমানদেরকে সে আযাব থেকে মুক্ত রাখার আবেদন করতেন। এভাবে আশা ও ভয় উভয়ই তাঁর মধ্যে একত্রিত থাকত। এ রেওয়ায়েত থেকে বুঝতে হবে, পঞ্চাশ আয়াতের বেশী না পড়া কোরআনী রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ পান্ডিত্যেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি ষোল বছর যাবত পেট ভরে আহার করি না। কেননা, উদরপূর্তি দেহ ভারী করে, অন্তর কঠোর এবং বুদ্ধিমত্তা হরণ করে। অধিক নিদ্রা আনয়নের কারণে এতে মানুষের এবাদত হ্রাস পায়। এ উক্তিতে তিনি উদরপূর্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বাস্তব প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এবাদতে তিনি কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তা তাঁর উদরপূর্তি বর্জন করা থেকেই বুঝা যায়। বলাবাহুল্য, কম আহার এবাদতের মূল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি কখনও আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম তো দূরের কথা, সত্য কসমও খাইনি। এ উক্তির প্রেক্ষিতে চিন্তা কর, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রতাপ সম্পর্কে তাঁর কতটুকু জ্ঞান ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকটি বলল ঃ আপনার প্রতি আল্লাহর

রহমত হোক, আপনি জওয়াব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ চুপ থাকার মধ্যে আমার কল্যাণ, নাকি জওয়াব দেয়ার মধ্যে– একথা না জানা পর্যন্ত আমি জওয়াব দেব না। এখন চিন্তা কর, তিনি জিহ্বার হেফাযত কতটুকু করতেন! অথচ ফেকাহবিদগণের সকল অঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই অধিক নিয়ন্ত্রণহীন। এ থেকে আরও বুঝা যায়, তাঁর কথা বলা ও চুপ থাকা সওয়াব অর্জনের উদ্দেশে হত। আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওয়াযীর বর্ণনা করেন ঃ একবার ইমাম শাফেয়ী লণ্ঠনের বাজার থেকে বের হলে আমরা তাঁর পেছনে চললাম। দেখি, এক ব্যক্তি জনৈক আলেমের সাথে বচসা করছে এবং তাকে মন্দ বলছে। ইমাম শাফেয়ী আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ অশ্লীল কথা শোনা থেকে কানকে রক্ষা কর, যেমন জিহ্বাকে বাজে বকাবকি থেকে রক্ষা করে থাক। কেননা, শ্রোতা বক্তার অশ্লীল বাক্য বিনিময়ে শরীক হয়ে থাকে। নির্বোধ ব্যক্তি তার মগজে যে সর্বাধিক খারাপ বিষয় জমিয়ে রাখে, তা তোমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চায়। যদি তার কথা তাকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ, শোনা না হয়, তবে এসব যে শুনবে না সে ভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যে বলে, সে হতভাগ্য হয়। তিনি বলেন ঃ জনৈক দার্শনিক অন্যের কাছে পত্র লেখল, তোমাকে আল্লাহ তাআলা এলেম দান করেছেন। এই এলেম পাপাচারের অন্ধকার দ্বারা মলিন করো না। নতুবা যেদিন আলেমরা তাদের এলেমের নূরে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে।

ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় ঃ

তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি দাবী করে যে, তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও স্রষ্টার মহব্বত এক সাথে রয়েছে, সে মিথ্যাবাদী। হুমায়দী বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী একবার জনৈক শাসনকর্তার সাথে ইয়ামনে গমন করেন এবং সেখান থেকে দশ হাজার দেরহাম নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে মক্কার বাইরে এক গ্রামে তাঁবু স্থাপন করা হয়। জনগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে থাকে। তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বন্টন না করা পর্যন্ত সেখানে অনড় হয়ে রইলেন। একদিন তিনি হাম্মাম (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে হাম্মামের মালিককে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেন। একবার তাঁর হাত থেকে বেত পড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি তা তুলে দিল। তিনি এর

বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন। তাঁর দানশীলতা প্রসিদ্ধ। বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। যুহদ তথা সংসারবিমুখতার মূল হচ্ছে দানশীলতা। কারণ, যেব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত রাখে, সে তা আটকে রাখে এবং আলাদা করে না। ধন-সম্পদ সে-ই আলাদা করবে, যার দৃষ্টিতে সংসার নিকৃষ্ট হবে। যুহদের অর্থ তাই। ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা, অধিক খোদাভীতি এবং আখেরাতের কাজে নিজেকে মশগুল রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও সাক্ষ্য দান করে ঃ

একবার সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না তাঁর সামনে অন্তরের কোমলতা সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। লোকেরা সুফিয়ানকে বলল ঃ তিনি মারা গেছেন। সুফিয়ান বললেন ঃ মারা গেলে সমসাময়িক সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েই মারা গেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলখী বলেন ঃ একবার আমি ও ওমর ইবনে বানানা একত্রে বসে এবাদতকারী ও সংসারবিমুখদের কথা আলোচনা করেছিলাম। ওমর বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী অপেক্ষা অধিক পরহেযগার ও মিষ্টভাষী কাউকে দেখিনি। একবার আমি ইমাম শাফেয়ী ও হারেস ইবনে লবীদ সাফা পাহাড়ের দিকে গেলাম। হারেস ছিলেন সালেহ মুরারীর শিষ্য। তিনি সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ পাঠ করলেন, তখন আমি ইমাম শাফেয়ীকে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম। তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল এবং এবং তিনি কিছুক্ষণ ছটফট করে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ এলাহী, আমি আপনার কাছে মিথ্যুকদের জ্ঞান ও গাফেলদের বিমুখতা থেকে আশ্রয় চাই। এলাহী, আপনার জন্যেই সাধকদের অন্তর বিনম্র এবং ভক্তদের মাথা নত হয়। এলাহী, আপনার বদান্যতা থেকে আমাকে দান করুন এবং আমাকে কৃপার পর্দায় আবৃত্ত করুন। আপন সত্তার কৃপায় আমার ত্রুটি মার্জনা করুন। আবদুল্লাহ বলেন ঃ এর পর আমরা সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। আমি যখন বাগদাদ পৌঁছলাম, তখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে ছিলেন। একদিন আমি নদীর কিনারে বসে অযু করছিলাম। একব্যক্তি আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন বৎস, উত্তমরূপে অযু কর। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আমি পেছন ফিরে দেখলাম,

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পেছনে অনেক লোকজন রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি অযু করে তাদের পেছনে চললাম। বুযুর্গ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমার কোন কাজ আছে কি? আমি বললাম ঃ, হাঁ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে এলেম দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, যে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে নিষ্কৃতি পায়। যে দ্বীনের ভয় রাখে, সে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। যে দুনিয়াতে সংসারবিমুখ থাকে সে যখন কেয়ামতে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াব দেখবে, তখন তার চোখ ঠাণ্ডা হবে। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিতে পারে। প্রথম, অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং প্রথমে নিজে তা মেনে চলবে। দ্বিতীয়, মন্দ কাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করবে এবং প্রথমে নিজে বিরত থাকবে। তৃতীয়, আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমার খেয়াল রাখবে এবং তা অতিক্রম করবে না। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসারবিমুখ হয়ে থাকবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হবে। সবকিছুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য জানবে, এতে তুমি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পর্যন্ত বলে তিনি চলে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ইনিই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। এ রেওয়ায়েতে তাঁর বেহুঁশ হয়ে যাওয়া এবং উপদেশ দানের কথা চিন্তা কর। এতে তাঁর সংসারবিমুখতা ও প্রবল খোদাভীতি সম্পর্কে জানা যায়। এই ভীতি ও সংসারবিমুখতা আল্লাহ্‌র মারেফাত ব্যতীত অর্জিত হয় না। আল্লাহ্ বলেন–

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا۔

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই ভয় করে, যারা আলেম তথা জ্ঞানী।

ইমাম শাফেয়ী এই ভয় ও সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ফেকাহ্ শাস্ত্রের যেহার, লেয়ান, সলম, ইজারা ইত্যাদি থেকে অর্জন করেননি; বরং কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কেননা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দর্শনে কোরআন হাদীস পরিপূর্ণ। তাঁর দার্শনিক কথাবার্তা থেকে জানা যাবে, তিনি অন্তরের রহস্য ও আখেরাত সম্পর্কে কতদূর ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার রিয়া কি, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন ঃ রিয়া এক প্রকার

ফেতনা, যা বৈষয়িক কামনা-বাসনা অন্তরে উপস্থাপিত করেছে। মন মন্দ কাজে উৎসাহী বিধায় আলেমগণ এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে। ফলে তাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমল করতে গিয়ে আত্মম্ভরিতার আশংকা কর, তখন ভেবে দেখো কার সন্তুষ্টির জন্যে তুমি আমল করছ। তুমি কোন্ সওয়াবের প্রতি আগ্রহ কর এবং কোন্ আযাবকে ভয় কর। তুমি কোন্ নিরাপত্তার জন্যে কৃতজ্ঞ এবং কোন্ বিপদকে স্মরণ কর। এসব বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তোমার আমল তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ গণ্য হবে এবং তুমি আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এ উক্তিতে রিয়ার স্বরূপ ও আত্মম্ভরিতার প্রতিকার লক্ষণীয়। এগুলো অন্তরের জন্য অনিষ্টকর বিষয়সমূহের অন্যতম।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের নফসকে হেফাযতে না রাখে, তার এলেম উপকারী হয় না। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে, সে এলেমের রহস্য বুঝে। প্রত্যেক ব্যক্তির শত্রু মিত্র অবশ্যই থাকে। অতএব তুমি তাদের সাথেই থাক, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল।

বর্ণিত আছে, আবদুল কাহের ইবনে আবদুল আজীজ একজন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরহেযগারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সবর, ইমতেহান (পরীক্ষা) ও তমকীন্ (প্রতিষ্ঠা) এগুলোর মধ্যে কোন্টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ তমকীন পয়গম্বরগণের মর্তবা। এটা পরীক্ষার পরে অর্জিত হয়। সুতরাং পরীক্ষা হলে সবর হয় এবং সবরের পর তমকীন ও প্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষ্য কর, আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা নিয়েছেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। তদ্রূপ হযরত মূসা ও হযরত আইউব (আঃ)-এর প্রথমে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, এরপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বেলায় তেমনি প্রথমে পরীক্ষা এবং পরে প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। অতএব তমকীন তথা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ

এমনিভাবে আমি ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠা দান করেছি।

হযরত আইউব (আঃ)-এর ভীষণ পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاٰتَيْنَا اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ـ

"আমি তাঁকে তাঁর পত্নী ও তৎসহ আরও লোকদের দান করেছি। এটা আমার পক্ষ থেকে মেহেরবানী এবং এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ।"

ইমাম শাফেয়ীর এ জওয়াবে প্রতীয়মান হয়, কোরআনের রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং আল্লাহ্র পথের পথিকদের 'মকামাত' সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব বিষয় আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কখন আলেম হয়? তিনি বললেন ঃ মানুষ যখন তার জানা জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে অন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং যে বিষয় অর্জিত হয়নি, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, তখন সে আলেম হয়। সেমতে জালিনূসকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি যে এক রোগের জন্যে অনেকগুলো যৌথ উপাদান সম্বলিত ওষুধ লেখেন এর কারণ কি? জালিনূস বললেন ঃ উদ্দেশ্য একই ওষুধ। এর তীব্র প্রভাব হ্রাস করার জন্য অন্য ওষুধ সাথে দেয়া হয়। কেননা, একক ওষুধ মারাত্মক হয়ে থাকে। এ ধরনের আরও অনেক উক্তি দ্বারা মারেফত জ্ঞানে ইমাম শাফেয়ীর উচ্চ মর্তবা বুঝা যায়।

ইমাম শাফেয়ী ফেকাহ্ শাস্ত্র ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের বাহাস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করতেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতগুলো এর প্রমাণ।

তিনি বলেন ঃ আমি চাই মানুষ এই শাস্ত্র দ্বারা উপকৃত হোক এবং এর কোন কৃতিত্ব আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হোক। এতে জানা গেল, এলেমের অনিষ্ট ও সুখ্যাতি অর্জনের কুফল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন এবং খ্যাতির আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতেন।

তিনি বলেন ঃ আমি কখনও কারও সাথে তার ভ্রান্তি কামনা করে মুনাযারা তথা বিতর্ক করিনি। কারও সাথে আলোচনা করার সময় আমি কামনা করেছি যে, সে তওফীক, সততা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হোক এবং তার

প্রতি আল্লাহ তাআলার সমর্থন ও হেফাযত থাকুক। কারও সাথে কথা বলার সময় আমি এ বিষয়ের পরওয়া করিনি যে, সত্য আমার মুখ দিয়ে অথবা তার মুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক। সত্য বিষয় কারও সামনে পেশ করার পর যদি সে কবুল করে, তবে আমি তার ভক্ত হয়ে যাই। পক্ষান্তরে সত্য বিষয় নিয়ে কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তিতে আমার প্রমাণ খণ্ডন করলে সে আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যায়। আমি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ পরিহার করি। এসব আলামত দ্বারাই জানা যায়, ফেকাহ শাস্ত্র ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিতর্ক করার পেছনে ইমাম শাফেয়ীর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন।

এখন দেখ, বর্তমান যুগের লোকেরা পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে কিভাবে তার অনুসরণ করেছে! এই এক বিষয়েও তারা বিরোধ করে। এজন্যেই আবু সওর (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তি না আমি দেখেছি, না অন্য কেউ দেখেছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমি এমন কোন নামায পড়িনি,, যাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করিনি। এ রেওয়ায়েতে দোয়াকারীর ইনসাফ এবং যার জন্যে দায়া করা হয় তার মর্তবা লক্ষ্য কর এবং এর সাথে বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ, তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কতটুকু হিংসা-দ্বেষ রয়েছে। তারা পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনুসরণ করে বলে যে দাবী করে, তা ঠিক নয়। ইমাম আহমদকে বেশী দোয়া করতে দেখে তাঁর পুত্র একদিন বললেন ঃ ইমাম শাফেয়ী কে ছিলেন, যার জন্যে আপনি এত বেশী দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ বৎস! ইমাম শাফেয়ী পৃথিবীর জন্যে সূর্যের মত এবং মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্যের মত ছিলেন। এখন বল, এসব বিষয়ে কেউ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে কি?

ইমাম আহমদ আরও বলতেন ঃ যে কেউ দোয়াত স্পর্শ করে, সে ইমাম শাফেয়ীর কাছে ঋণী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (তুলা বিক্রেতা) বলেন ঃ আমি চল্লিশ বছর ধরে যত নামায পড়েছি, তাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করেছি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এলেম দান করেছেন এবং তিনি তার মাধ্যমে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর গুণাগুণ হিসাবের বাইরে বিধায় আমরা এতটুকু উল্লেখ করেই শেষ করছি। নসর ইবনে ইবরাহীম মাকদেসী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ীর

গুণাবলী সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, বর্ণিত অধিকাংশ বিষয় সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-ও বর্ণিত পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে মালেক! এলেম অন্বেষণ করার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ ভাল। বরং যেব্যক্তি (এলেমের জন্যে) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে না, তুমিও তার সঙ্গ ত্যাগ করো না। তিনি দ্বীনের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতেন। এমনকি যখন হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে ওযু করতেন, বিছানায় বসে দাড়িতে চিরুনি করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, অতঃপর গাম্ভীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের সম্মান করতে চাই। তিনি বলেন ঃ এলেম একটি নূর। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা তা অর্জিত হয় না। এলেমের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন একথাই প্রমাণ করে, তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র মহিমার মারেফত অত্যন্ত প্রবল ছিল।

এলেম দ্বারা ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এটা তাঁর এ উক্তি থেকে জানা যায়, দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক করা অর্থহীন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর এ উক্তিও এর প্রমাণ। তিনি বলেন, আমি যখন ইমাম মালেকের কাছে উপস্থিত হই তখন তাঁকে ৪৮টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি ৩২টি প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ আমি জানি না। যেব্যক্তির এলেম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনও এমনভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করতে সম্মত হয় না। এ জন্যেই ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আলেমদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলতে হয়, ইমাম মালেক তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা। ইমাম মালেকের চেয়ে বেশী আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ হয়নি। বর্ণিত আছে, আবু জাফর মনসুর ইমাম মালেককে জবরদস্তি তালাকের হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে এই প্রকার তালাকের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি সকলের সামনে বলে দিলেন ঃ যেব্যক্তিকে জবরদস্তিমূলকভাবে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, তার তালাক হয় না। এতে আবু জাফর তাঁকে বেত্রাঘাত করেন, কিন্তু তিনি হাদীসের বর্ণনা বর্জন করেননি।

ইমাম মালেক বলেন ঃ যেব্যক্তি কথায় পাকা– মিথ্যা বলে না, তার বুদ্ধি তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে তার বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেয় না। সংসারের প্রতি ইমাম মালেকের নির্লিপ্ততা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়–

আমিরুল মুমিনীন মাহদী ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাতে চাই। আমি রবিয়া ইবনে আবী আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি– মানুষের পরিবার-পরিজনই তার গৃহ।

খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন– না। খলীফা তাঁকে একটি বাড়ী ক্রয় করার জন্যে তিন হাজার দীনার দিলেন। তিনি তা রেখে দিলেন, ব্যয় করলেন না। অতঃপর খলীফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় ইমাম মালেককে বললেন ঃ আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি আপনার হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই, যেমন হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম মালেক জওয়াবে বললেন, মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে পৌঁছে গেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের কাছে হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ اختلاف امتى رحمة আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। এখন রইল আপনার সাথে যাওয়ার বিষয়টি। এটাও হতে পারে না। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون যদি মদীনাবাসীরা বুঝে, তবে মদীনা তাদের জন্যে উত্তম। তিনি আরও বলেন–

المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكيد خبث الحديد.

"মদীনা তার ময়লা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কর্মকারের

রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয়।" আপনার দীনার যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রাখা আছে। ইচ্ছা হলে নিয়ে যান, ইচ্ছা হলে রেখে যান। অর্থাৎ, আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করাতে চান এই বলে যে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি দীনারকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনার উপর অগ্রাধিকার দেই না। এটা ছিল ইমাম মালেকের সংসারবিমুখতা।

যখন তাঁর এলেম ও শিষ্যদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সব দিক থেকে অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে আসতে থাকে, তখন তিনি সমুদয় অর্থ সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দিতেন। এই দানশীলতা থেকে দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনাসক্তি সম্পর্কে জানা যায়। মানুষের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকা সংসারবিমুখতা নয়; বরং অর্থ সম্পদের প্রতি অন্তরের বেপরওয়া ভাবকেই বলা হয় সংসারবিমুখতা। হযরত সোলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

ইমাম মালেক দুনিয়াকে হেয় মনে করতেন– একথা ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়। তিনি বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের দরজায় খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চরের এমন উৎকৃষ্ট একটি পাল দেখলাম, যা আমি কোনদিন দেখিনি। আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, কি চমৎকার পাল! তিনি বললেন ঃ আবু আবদুল্লাহ! এ পাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপঢৌকন। আমি বললাম ঃ আপনি নিজে সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি রেখে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ করি, যে মাটিতে তাঁর পয়গম্বর (সাঃ) শায়িত আছেন, সে মাটি আমার ঘোড়া পদদলিত করবে? এ রেওয়ায়েতে ইমাম মালেকের দানশীলতা লক্ষণীয়। তিনি সকল ঘোড়া ও খচ্চর একযোগে দান করেছিলেন। এরপর মদীনা তাইয়্যেবার পবিত্র মাটির সম্মানের কথাও চিন্তা কর।

ইমাম মালেক বর্ণিত নিম্নোক্ত কাহিনী দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁর এলেমের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

তিনি বলেন ঃ আমি খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসা যাওয়া করুন। যাতে আমার ছেলেরা আপনার কাছে মুয়াত্তার হাদীসসমূহ শুনতে পারে। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে উন্নতি দান করুন। এই এলেম আপনাদের নিকট

থেকে বের হয়েছে। আপনারা এর সম্মান করলে সে সম্মানিত হবে। আর যদি আপনারা এর অবমাননা করেন তবে এ এলেম লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। মানুষ এলেমের কাছে যায়। এলেম মানুষের কাছে যায় না। খলীফা বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলছেন। অতঃপর খলীফা ছেলেদেরকে মসজিদে গিয়ে সকলের সাথে মুয়াত্তা শ্রবণ করার আদেশ দিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা কুফী (রহঃ)-ও আবেদ, যাহেদ, আরেফ বিল্লাহ, আল্লাহভীরু এবং এলেমের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী ছিলেন। ইবনে মোবারক বর্ণিত রেওয়ায়েতে তাঁর সাধারণ এবাদতের অবস্থা জানা যায়। তিনি শালীনতাসম্পন্ন ছিলেন এবং অত্যধিক নামায পড়তেন। আসাদ ইবনে আবী সোলায়মান বর্ণনা করেন– তিনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি প্রথমে অর্ধ রাত্রি এবাদত করতেন। এক দিন পথ চলার সময় এক ব্যক্তি তাঁর দিকে ইশারা করল এবং অন্য একজন বলল ঃ ইনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন। এই মন্তব্য শুনার পর থেকে ইমাম সাহেব সমস্ত রাত্রি এবাদত শুরু করে দেন এবং বলেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি এ জন্যে যে, আমি তাঁর যতটুকু এবাদত করি না, মানুষ ততটুকু বলাবলি করে।

নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ইমাম সাহেবের সংসারবিমুখতা প্রমাণিত হয়। রবী ইবনে আসেম বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রার নির্দেশক্রমে আমি ইমাম সাহেবকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ইমাম সাহেবকে বায়তুল মালের প্রশাসক নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইমাম সাহেবকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দেন এবং তা পালিত হয়। লক্ষণীয়, তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করলেন বটে, কিন্তু প্রশাসক হতে স্বীকৃত হলেন না। হাকাম ইবনে হেশাম সকফী বলেন ঃ সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি ইমাম সাহেব সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করল, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিলেন। বাদশাহ্ সরকারী ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন এবং তা গ্রহণ না করলে তাঁকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিলেন এবং আল্লাহর আযাব ভোগ করার দুঃসাহস করলেন না।

ইবনে মোবারকের সামনে আবু হানীফার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা সে ব্যক্তির কথা কি বলছ, যাঁর সামনে দুনিয়া পেশ

করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্যের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, একবার ইমাম সাহেবকে কেউ বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুর আপনাকে দশ হাজার দেরহাম দিতে আদেশ করেছেন। ইমাম সাহেব সম্মত হলেন। যেদিন এই দেরহাম আসার কথা ছিল, সেদিন ইমাম সাহেব ফজরের নামায পড়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং কারও সাথে কোন কথা বললেন না। খলীফার দূত হাসান ইবনে কাহতাবা যখন সে অর্থ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল, তখনও তিনি কিছুই বললেন না। উপস্থিত এক ব্যক্তি দূতকে জানাল, তিনি আমাদের সাথেও কম কথাই বলেন; অর্থাৎ কথা না বলাই তাঁর অভ্যাস। আপনি এই অর্থ এই থলের মধ্যে ভরে গৃহের কোণে রেখে দিন (তাই করা হল)। অতঃপর দীর্ঘ দিন পরে ইমাম সাহেব যখন তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ওসিয়ত করেন, তখন পুত্রকে বললেন ঃ আমার মৃত্যু হলে দাফনের পর এ থলেটি হাসান ইবনে কাহ্তাবার কাছে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ এটা আপনার আমানত, যা আপনি আবু হানীফার কাছে সোপর্দ করেছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র ওসিয়ত অনুযায়ী থলেটি পৌঁছে দিলে হাসান ইবনে কাহ্তাবা বললেন ঃ আপনার পিতার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। তিনি ধর্ম-কর্মের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন।

বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে তো বাস্তবিকই এ পদের যোগ্য নই। পক্ষান্তরে যদি মিথ্যাবাদী হই তবে মিথ্যাবাদী কখনও বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্যে উপযুক্ত হতে পারে না।

ইমাম সাহেব যে আখেরাত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং আরেফ বিল্লাহ ছিলেন, তা এ থেকে জানা যায় যে, তিনি আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন এবং সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। সেমতে ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ আমি অবগত হয়েছি, তোমাদের এই নো'মান ইবনে সাবেত কুফী আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ভয় করেন। শুরাইক নখয়ী বলেন ঃ ইমাম আযম খুব চুপচাপ থাকতেন, চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মানুষের সাথে কম কথা

বলতেন। এসব বিষয় উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি এলমে বাতেন ও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল থাকতেন। কারণ, যে চুপচাপ থাকা ও সংসারবিমুখতা প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞানে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এ হচ্ছে ইমামত্রয়ের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সওরীর অবস্থা এই যে, তাঁদের অনুসারী পূর্বোক্ত ইমামত্রয়ের অনুসারীদের তুলনায় কম, কিন্তু তাঁরা পরহেযগারী ও সংসারবিমুখতায় অধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁদের উভয়ের কর্ম ও উক্তিতে পরিপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই।

এখন তুমি ইমামত্রয়ের সীরাত সম্পর্কে চিন্তা কর, এসব অবস্থা, কর্ম ও উক্তি কিসের ফল। তাঁরা যে সংসারবিমুখ ছিলেন এবং খাঁটিভাবে খোদাপ্রেমিক ছিলেন, এটা কি ফেকাহ্র শাখাগত মাসআলা তথা সলম, ইজারা, যেহার, ঈলা ও লেয়ান জানার ফল হতে পারে, না অন্য শাস্ত্র দ্বারা অর্জিত, যা ফেকাহ্ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? আরও চিন্তা কর, যারা নিজেদেরকে তাঁদের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয় কোন কোন জ্ঞান মন্দ কেন

প্রশ্ন হতে পারে, যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমনি জানাকে বলা হয় এলেম। এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম সিফাত বা গুণ। এমতাবস্থায় এলেম মন্দ ও নিন্দনীয় কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, এলেম স্বয়ং মন্দ হয় না; বরং তিনটি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিতির কারণে এলেমকে মন্দ বলা হয়। তিনটি কারণ এই : (১) এমন এলেম, যা আলেমের জন্যে অথবা অন্যের জন্যে ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। যেমন, জাদুবিদ্যা ও তেলেসমাতি বিদ্যাকে মন্দ বলা হয়। অথচ জাদুবিদ্যা সত্য। কোরআন এর সাক্ষী। মানুষ জাদুকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজে ব্যবহার করে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর কেউ জাদু করেছিল।

ফলে তিনি অসুস্থ হয় পড়েছিলেন। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) এসে সংবাদ দেন এবং একটি কূপের ভেতরে পাথরের নীচ থেকে সে জাদু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

জাদু এক প্রকার জ্ঞান, যা পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও তারকা উদয়ের মধ্যে গণনামত বিষয়সমূহ জানার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমে পদার্থ দ্বারা সে ব্যক্তির একটি পুত্তলিকা তৈরী করা হয়, যার উপর জাদু করতে হবে। এরপর তারকা উদয়ের একটি বিশেষ সময়ের জন্যে অপেক্ষা করা হয়। যখন সেই সময় আসে তখন পুত্তলিকার উপর কতিপয় কুফরী কলেমা ও শরীয়ত বিরোধী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে এগুলোর মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এসব তদবীরের ফলে আল্লাহ্র নিয়মানুযায়ী জাদুকৃত ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জ্ঞান হিসাবে এসব বিষয় জানা মন্দ নয়। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া এবং অনিষ্টের ওসিলা হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর যোগ্যতা এসবের মধ্যে নেই বিধায় এ বিদ্যাকে নিন্দনীয় বলা হয়। যদি কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কোন ওলীকে হত্যা করতে মনস্থ করে এবং ওলী তার ভয়ে কোন সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করেন, তবে জানা সত্ত্বেও ওলীর ঠিকানা অত্যাচারীকে বলা উচিত নয়। এস্থলে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অথচ জিজ্ঞাসার জওয়াবে তার ঠিকানা বলা সত্য অবস্থা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পরিণতি ক্ষতিকর বিধায় এটা মন্দ।

(২) যে এলেম প্রায়শঃ আলেমের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে থাকে– যেমন জ্যোতির্বিদ্যা। এটা সত্তার দিক দিয়ে মন্দ নয়। কেননা, এটা হিসাব সংক্রান্ত বিষয়। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ; وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ - অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গতি হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আরও বলা হয়েছে–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

অর্থাৎ, আমি চন্দ্রকে কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে সে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় সরু হয়ে যায়।

অথবা জ্যোতির্বিদ্যার সারমর্ম হচ্ছে কারণ দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা। এটা চিকিৎসকের নাড়ি দেখে ভাবী রোগের কথা বলে দেয়ার মতই। মোট কথা, জ্যোতির্বিদ্যা জানার মানে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার

নির্ধারিত নিয়মকে জানা। কিন্তু শরীয়ত একে মন্দ বলে আখ্যা দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তকদীরের আলোচনা হয় তখন নীরব হয়ে যাও। যখন জ্যোতির্বিদ্যার কথা বলা হয় তখন নীরব থাক এবং যখন আমার সাহাবীগণের প্রসঙ্গ উঠে তখন নীরব থাক। তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ে ভয় করি– (ক) শাসকদের জুলুম করা, (খ) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী হওয়া এবং (গ) তকদীর অস্বীকার করা।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জ্যোতির্বিদ্যা এ পরিমাণে অর্জন কর যাতে স্থলে ও পানিতে পথ প্রাপ্ত হতে পার। এতটুকু অর্জন করেই ক্ষান্ত হও।

তিন কারণে জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অধিকাংশ মানুষের জন্যে এটা ক্ষতিকর। অর্থাৎ, যখন মনে একথা উদয় হয় যে, তারকার গতিবিধির দরুনই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হতে থাকে যে, তারকারাজিই প্রভাব বিস্তারকারী এবং সেগুলোই উপাস্য। সেগুলো ঊর্ধ্বাকাশে বিরাজমান থাকে বিধায় মনে সেগুলোর সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আন্তরিক মনোযোগ সেগুলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে। কল্যাণের আশা এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষাপ্রাপ্তি তারকারাজির সাথেই সম্পৃক্ত বলে ধারণা হতে থাকে। এতে করে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ মন থেকে মুছে যায়। কেননা, দুর্বল বিশ্বাসীদের দৃষ্টি উপায় পর্যন্তই সীমিত থাকে। পাকা আলেম ব্যক্তি অবশ্যই জানেন, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সকলেই আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে মাত্র। দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তি সূর্যের কিরণ সূর্যোদয়ের কারণে দেখে। উদাহরণতঃ যদি পিপীলিকাকে বুদ্ধিমান ধরে নেয়া হয় এবং সে কাগজের উপর থেকে লক্ষ্য করে যে, কলমের কালি দ্বারা কাগজ কাল হয়ে যাচ্ছে, তবে সে এটাই বিশ্বাস করবে যে, লেখা কলমেরই কাজ। তার দৃষ্টি কলম থেকে আঙ্গুলের দিকে, আঙ্গুল থেকে হাতের দিকে, হাত থেকে ইচ্ছার দিকে, ইচ্ছা থেকে ইচ্ছাকারী লেখকের দিকে এবং লেখক থেকে তার শক্তি ও হাত সৃষ্টিকারীর দিকে উন্নতি করবে না। মোট কথা, মানুষের দৃষ্টি প্রায়ই নিকটের ও নিম্নের কারণসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ থেকে সকল কারণের মূল কারণের দিকে উন্নতি করা থেকে বিরত থাকে। তাই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ, জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়াবলী নিছক অনুমানভিত্তিক। তাই এর মাধ্যমে কোন কিছু বলা মূর্খতার উপর ভিত্তি করে বলারই নামান্তর। এমতাবস্থায় এটা মূর্খতা হিসাবে মন্দ– বিদ্যা হিসাবে নয়। কেননা, এটা ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর মোজেযা, যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদের কোন কথা ঘটনাচক্রেই সত্য হয়ে থাকে। কেননা, জ্যোতির্বিদ মাঝে মাঝে কোন কারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে। সেই কারণের পর অনেকগুলো শর্তের অনুপস্থিতির দরুন ঘটনা সংঘটিত হয় না। এ সব শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। সুতরাং যদি ঘটনাচক্রে আল্লাহ্ তাআলা অবশিষ্ট শর্তগুলোও উপস্থিত করে দেন, তখন জ্যোতির্বিদের কথা সত্য হয়ে যায়। অন্যথায় তার কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এটা এমন যেন কেউ দেখল, পাহাড়ের উপর থেকে মেঘমালা উঠে উঠে একত্রিত হচ্ছে এবং চলাফেরা করছে। এতে সে অনুমান করে বলে দিল, আজ বৃষ্টি হবে। অথচ প্রায়ই এমন মেঘমালার পরেও রৌদ্র উঠে পড়ে এবং মেঘ কেটে যায়। কখনও বৃষ্টি হলেও কেবল মেঘমালাই বৃষ্টিপাতের জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত অন্যান্য কারণগুলোর সমাবেশ না ঘটে।

অনুরূপভাবে মাঝির অনুমান করা যে, নৌকা সহীহ্ সালামত থাকবে। মাঝি বাতাসের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে এবং এর উপর ভরসা করেই একথা বলে। অথচ বাতাসের দিক পরিবর্তনের আরও গোপন কারণ রয়েছে। সেগুলো মাঝি জানে না। ফলে কখনও তার অনুমান সত্য এবং কখনও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। এ জন্যেই দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তিকেও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ, এই বিদ্যার দ্বারা কোন উপকারই হয় না। কেননা, এতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামানো হয়। মানুষের মূল্যবান জীবন অনুপকারী কাজে বিনষ্ট করা যে খুবই ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির চার পাশে অনেক লোককে জমায়েত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটি কে? লোকেরা বলল ঃ সে একজন বড় পণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কি বিষয়ে পণ্ডিত? উত্তর হল, কাব্যে ও আরবদের বংশ জ্ঞানে। তিনি বললেন ঃ এ বিদ্যা উপকারী নয়; বরং এটা এমন মূর্খতা যা ক্ষতিকরও বটে। তিনি আরও বললেন ঃ

انما العلم اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة۔

অর্থাৎ, বিদ্যা তিনটি কোরআনের অকাট্য আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং কোরআন ও সুন্নতে বর্ণিত ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক জ্ঞান।

এতে প্রমাণিত হয়, জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রে মাথা ঘামানো বিপদাশংকায় পতিত হওয়া এবং মূর্খতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। কারণ, তকদীরে যা আছে তা হবেই। তা থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব। চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ নয়। এর প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ এর প্রমাণ দেখা যায়।

বিদ্যা যে কিছু লোকের জন্যে নিশ্চিত ক্ষতিকর, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, পাখীর গোশত দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে ক্ষতিকর। বরং কোন কোন লোকের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকাই উপকারী হয়ে থাকে। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে তার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ করলে চিকিৎসক স্ত্রীর নাড়ি পরীক্ষা করে বলল ঃ এখন সন্তান লাভের জন্যে চিকিৎসা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা নাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা যাবে। একথা শুনে স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সে তার ধন-সম্পদ বন্টন ও ওসিয়ত করে পানাহার পরিহার করল এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হল না। তার স্বামী চিকিৎসককে এ কথা জানালে চিকিৎসক বলল ঃ আমি জানতাম, সে মরবে না। এখন তার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভে তোমার সন্তান হবে। স্বামী জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে বললেন? চিকিৎসক বললেন, অধিক মোটা হওয়ার কারণে মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে চর্বির পরত পড়ে যাচ্ছিল। এটাই ছিল গর্ভ ধারণের অন্তরায়। আমি মনে করলাম, মৃত্যু ভয় ছাড়া সে ক্ষীণাঙ্গিনী হবে না। তাই তার মনে মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এখন তার গর্ভধারণের অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। এ গল্প থেকে জানা যায়, কতক বিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার মধ্যে বিপদাশংকা থাকে। এ থেকেই এ হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়– نعوذ بالله من علم لا ينفع

–অনুপকারী বিদ্যা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতএব শরীয়ত যেসব জ্ঞানের নিন্দা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করো না এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নতের অনুসরণ করো। এ অনুসরণেই নিরাপত্তা নিহিত এবং ঘাঁটাঘাঁটিতে বিপদ লুক্কায়িত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من العلم جهلا وان من القول عيا

–নিশ্চয় কোন কোন এলেম মূর্খতা এবং কোন কোন কথা হয়রানির কারণ।

বলাবাহুল্য, এলেম মূর্খতা হয় না; কিন্তু ক্ষতিসাধনে তার প্রভাব মূর্খতার অনুরূপ হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সামান্য তওফীক অনেক এলেম অপেক্ষা উত্তম। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ বৃক্ষ অনেক, কিন্তু সবগুলো উপকারী নয়।

শব্দ পরিবর্তিত এলেম

প্রকাশ থাকে যে, মন্দ এলেম শরীয়তগত এলেমের সাথে মিশে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষ উৎকৃষ্ট নামসমূহ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে ভিন্ন অর্থে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এসব নাম যে উদ্দেশে ব্যবহার করতেন, মানুষ সেসব নাম বিকৃত করে অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এরূপ শব্দ পাঁচটি– ফেকাহ্, এলেম, তওহীদ, তায্কীর ও হেকমত। এগুলো উৎকৃষ্ট শব্দ। এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনের স্তম্ভ হতেন। কিন্তু এখন এগুলো মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্যই এখন এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গের নিন্দা করা হলে তা আশ্চর্য ঠেকে। কেননা, প্রথমে এগুলো দ্বারা উত্তম ব্যক্তিবর্গ বিশেষিত হতেন।

প্রথম শব্দ ফেকাহকে আজকাল বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে– পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ, ফেকাহ্ হচ্ছে আশ্চর্য ধরনের শাখাগত বিষয় ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানা, এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কিত উক্তিসমূহ মুখস্থ করা। যেব্যক্তি এ সম্পর্কে খুব চিন্তা-ভাবনা করে এবং অধিক মশগুল থাকে, তাকে বড় ফেকাহ্‌বিদ বলা হয়। অথচ পূর্ববর্তী যুগে ফেকাহ্ শব্দের এ অর্থ ছিল না; বরং তখন অর্থ ছিল আখেরাতের পথ এবং নফসের সূক্ষ্ম বিপদাপদ ও অনিষ্টকর আমলসমূহ জানা, ঘৃণিত দুনিয়া সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হওয়া, আখেরাতের আনন্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং অন্তরে ভয়-ভীতি আচ্ছন্ন থাকা। এর প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি–

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْآ اِلَيْهِمْ -

"যাতে দ্বীন সম্পর্কে বোধশক্তি অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করে।"

অতএব, যে ফেকাহ্ দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হয়, সেটিই আমাদের বর্ণিত ফেকাহ্। তালাক, গোলাম মুক্ত করার মাসআলা এবং লেয়ান, সলম ও ইজারার শাখাগত বিষয়াদি নয়। কারণ, এগুলো দ্বারা মোটেই সতর্ক করা হয় না। বরং কেউ সদা সর্বদা এসব বিষয়ে মশগুল থাকলে তার অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا -

"তারা তাদের অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে না।" অর্থাৎ তারা ঈমানের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করে না। ফতোয়া হৃদয়ঙ্গম না করা উদ্দেশ্য নয়। মনে হয় ফেকাহ্ ও ফাহম সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। পূর্বে ও বর্তমানে এগুলো সে অর্থে ব্যবহৃত হত, যা আমরা লিখেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاَ اَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

"নিশ্চয় তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয় বেশী। এটা এজন্যে যে, তারা বুঝে না।"

এ আয়াতে কাফেররা যে আল্লাহকে কম ভয় করে এবং মানুষকে বেশী ভয় করে সে বিষয়কেই ফেকাহ্র অভাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এটা শাখাগত ফতোয়া মনে না রাখার ফল, না আমরা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো না থাকার ফল? রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেছিলেন ঃ তোমরা বিজ্ঞ, দার্শনিক ও ফকীহ্। অথচ তারা শাখাগত ফতোয়া অবগত ছিল না।

মা'দ ইবনে ইবরাহীম যুহরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিক ফকীহ্ কে? তিনি বললেন ঃ যে

আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে। তিনি যেন ফেকাহর ফলাফল বলে দিয়েছেন। খোদাভীতি বাতেনী এলেমের ফল– ফতোয়া ও মামলা-মোকদ্দমার ফল নয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ ফকীহ কে, আমি কি তোমাদেরকে তা বলব না? লোকেরা আরজ ক'রল ঃ জি হাঁ বলুন। তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাঁর আযাব থেকে নির্ভীক করে না এবং অন্য কিছুর আশায় কোরআন বর্জন করে না।

একবার আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন ঃ

لان اقعد مع قوم تذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب الى من ان اعتق اربع رقاب -

যারা ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে বসা আমার কাছে চারটি গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) ইয়াযীদ রাকাশী ও যিয়াদ নিমেরীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "পূর্বে যিকিরের মজলিস তোমাদের এসব মজলিসের মত ছিল না। তোমাদের একজন কিসসা বলে, ওয়াজ করে, মানুষের সামনে খোতবা পাঠ করে এবং একের পর এক হাদীস বর্ণনা করে। আর আমরা বসে ঈমানের আলোচনা করতাম, কোরআন বুঝতাম, দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতাম এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ণনা করতাম।" এ রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) কোরআন বুঝা ও নেয়ামত বর্ণনাকে 'তাফাক্কুহ্' তথা দ্বীনের জ্ঞান বলেছেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মানুষ পূর্ণ ফকীহ হয় না যে পর্যন্ত আল্লাহর ব্যাপারে অপরকে নিজের প্রতি নাখোশ না করে এবং কোরআনের বহু অর্থে বিশ্বাস না করে। এ রেওয়ায়েতটি আবু দারদার উপর মওকুফও বর্ণিত আছে। তাতে আরও আছে, এরপর সে নিজের নফসের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তার প্রতি সর্বাধিক নাখোশ থাকবে।

ফারকাদ সনজী (রহঃ) কোন বিশেষ বিষয় হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস

করলেন। জওয়াব শুনে ফারকাদ বললেন, ফেকাহবিদরা আপনার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। হাসান বসরী বললেন ঃ হে ফারকাদ! তুমি কি ফেকাহবিদ স্বচক্ষে কোথাও দেখেছ? ফকীহ সে ব্যক্তি, যে সংসারের প্রতি বিমুখ, পরকালের প্রতি উৎসাহী, দ্বীনের ব্যাপারে বুদ্ধিমান, বিরতিহীনভাবে পরওয়ারদেগারের এবাদতকারী, পরহেযগার, মুসলমানদের বিমুখতা থেকে আত্মরক্ষাকারী, তাদের ধন-সম্পদের প্রতি বিমুখ এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এখানে হযরত হাসান বসরী এতগুলো বিষয় উল্লেখ করলেন, কিন্তু একথা বললেন না যে, ফকীহ ফেকাহ শাস্ত্রের শাখাগত ফতোয়ারও হাফেয হবে। আমরা একথা বলি না যে, ফেকাহ শব্দটি বাহ্যিক বিধানাবলীর ফতোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং আমরা বলি, ব্যাপক অর্থে ফতোয়ার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হত। তবে অধিকাংশ মনীষী ফেকাহ শব্দটি আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থেই ব্যবহার করতেন। এখন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষ ধোঁকায় পড়েছে। তারা কেবল ফতোয়ার বিধানাবলীতেই মশগুল হয়ে পড়েছে এবং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা এ পছন্দের উপর মনের দিক থেকে একটি ভরসা পেয়েছে। কেননা, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র সূক্ষ্ম বিধায় তা পালন করা কঠিন। তার মাধ্যমে সরকারী পদ, জাঁকজমক ও অর্থকড়ি লাভ করা দুরূহ। তাই শয়তান এই বাহ্যিক ফেকাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার খুব সুযোগ পেয়েছে। যে ফেকাহ্ শরীয়তের একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র ছিল, শয়তান তা বিশেষ ফতোয়া শাস্ত্রের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়, এলেম শব্দটি পূর্বে আল্লাহর মারেফত, তাঁর আয়াতসমূহের অবগতি এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ক্রিয়াকর্ম চেনার অর্থে ব্যবহৃত হত। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ مات تسعة اعشار العلم এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এলেমকে মারেফত বলেছেন এবং নিজেই তফসীর করেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র এলেম উদ্দেশ্য।

মানুষ এ শব্দটিও বিশেষ অর্থে ধরে নিয়েছে। তারা প্রচার করে দিয়েছে, যেব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাথে ফেকাহ্র মাসআলা মাসায়েল নিয়ে খুব বিতর্ক করে এবং এতে ব্যাপৃত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই আলেম।

শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তার মাথায়ই শোভা পায়। পক্ষান্তরে যে বিতর্কে পারদর্শী নয়, অথবা তাতে পিছিয়ে থাকে, মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে এবং আলেমদের মধ্যে গণ্য করে না। বস্তুতঃ এলেমের এ অর্থ পূর্বে ছিল না। এটা তাদেরই কারসাজি। এলেম ও আলেমের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সেসব আলেমের বিশেষণ, যাঁরা আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর বিধিবিধান, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এখন আলেম তাদেরকে বলা হয়, যারা শরীয়তের এলেম তো রাখেই না, কেবল বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে ঝগড়া-কলহ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। এতেই তারা অদ্বিতীয় আলেমগণের মধ্যে পরিগণিত হয়, যদিও তফসীর, হাদীস ইত্যাদি কিছুই জানে না। এ বিষয়ই অনেক শিক্ষার্থীর জন্যে মারাত্মক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় শব্দ তওহীদের অর্থ এবং কালাম শাস্ত্র ও বিতর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, প্রতিপক্ষের বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা আয়ত্ত করা, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তৈরী করা, অধিক আপত্তি বের করা এবং প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করা। ফলে এ ধরনের অনেক নতুন দল নিজেদের উপাধি সাব্যস্ত করছে 'আহলে আদল ও তওহীদ' এবং কালামশাস্ত্রীদের নাম রেখেছে তওহীদের আলেম। অথচ এ শাস্ত্রের যেসব বিষয়বস্তু উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই প্রথম যুগে ছিল না; বরং তখন যারা বিতর্ক ও কলহের সূত্রপাত করত, তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হত। সে যুগের লোকেরা কোরআন পাকে বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রমাণই হৃদয়ঙ্গম করত এবং তখন কোরআনের শিক্ষাই ছিল পূর্ণ শিক্ষা। তাদের মতে পরকালীন বিষয়কে তওহীদ বলা হত। এটা কালামশাস্ত্রীরা বুঝে না, বুঝলেও আমলে আনেন না। পরকাল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, উপায় ও কারণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে ভাল মন্দ সকল কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এটা তওহীদের একটি প্রধান মূলনীতি। এরই ফল হচ্ছে তওয়াক্কুল, যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এ তওহীদেরই এক ফল ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ বললেন ঃ আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসকই আমাকে অসুস্থ করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে— হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

চিকিৎসক আপনার রোগ সম্পর্কে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক বলেছেন– اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আমি যা চাই, তাই করি।

তওহীদ এমন একটি উৎকৃষ্ট রত্ন, যার দু'টি আবরণ রয়েছে এবং আর দুটির একটি অপরটি অপেক্ষা রত্ন থেকে দূরবর্তী। লোকেরা তওহীদ শব্দটিকে বিশেষ আবরণের অর্থে এবং সেই বিশেষ শাস্ত্রের অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যদ্দ্বারা আবরণের হেফাযত হয়। তারা আসল রত্ন বাদ দিয়েছে। তওহীদের প্রথম আবরণ হচ্ছে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। এ তওহীদ খৃস্টানদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদের বিপরীত। কিন্তু এ তওহীদ কখনও মোনাফেকের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়; যার অন্তর বাইরের বিপরীত। তওহীদের দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করে, অন্তরে তার বিষয়বস্তুর বিপরীত বিশ্বাস না থাকা; বরং অন্তরে তা সত্য বলে প্রত্যয় থাকা। এটা সর্বসাধারণের তওহীদ। কালামশাস্ত্রীরা এ তওতীদকেই বেদআত থেকে রক্ষা করে। আর আসল রত্ন তওহীদ হচ্ছে উপায় ও কারণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা এবং বিশেষভাবে তাঁরই এবাদত করা, অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত না করা। যারা নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, তারা এ তওহীদের বাইরে অবস্থান করে। কেননা, যেব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে তার খেয়াল খুশীকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়। আল্লাহ বলেন ঃ اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ

"তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যে তার খেয়াল খুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে?"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের খেয়াল খুশী হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য উপাস্য, যার উপাসনা পৃথিবীতে করা হয়। আসলেও চিন্তা করলে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারীরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তির পূজা করে না; বরং মনের খেয়াল খুশীর পূজা করে। কারণ, তাদের মন বাপদাদার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। তারা সেই আকর্ষণের অনুসরণ করে।

মানুষের প্রতি রাগ করাও এ তওহীদের পরিপন্থী। কেননা, যেব্যক্তি ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করলে, সে অন্যের প্রতি কিরূপে রাগ করতে পারে? মোট কথা, পূর্বে এ স্তরকে তওহীদ বলা হত। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। মানুষ একে কিভাবে পাল্টে

দিয়েছে এবং ব্যক্তিক আবরণটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে! তারা এ আবরণকেই প্রশংসা ও গর্বের বস্তু সাব্যস্ত করেছে। অথচ এটা প্রশংসার মূল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে কেবলামুখী হয়ে বলে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا ـ

"আমি একাগ্রতা সহকারে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"

এখন যদি তার অন্তর বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে না থাকে, তবে এর অর্থ এই হবে যে, সে প্রত্যহ দিনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার সাথে মিথ্যা বলে। কেননা, মুখের অর্থ যদি বাহ্যিক মুখ হয় তবে সেটা তো সব দিক থেকে ফিরিয়ে কাবার দিকে রাখা হয়েছে। কা'বা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দিক নয় যে, কেউ কা'বার দিকে মুখ করলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখ করা হবে। আর যদি মুখের অর্থ হয় অন্তরের ধ্যান, যা এবাদতের উদ্দেশ্য, তবে যেখানে অন্তর পার্থিব প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত, অর্থসম্পদ ও জাঁকজমক সঞ্চয়ের কৌশল আবিষ্কারে মগ্ন এবং সম্পূর্ণরূপে সেদিকেই নিবিষ্ট, সেখানে একথা কেমন করে সত্য হবে যে, আমি আমার মুখ সেই আল্লাহর দিকে করলাম, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? এ বাক্যটি আসল তওহীদের স্বরূপ জ্ঞাপন করে। বাস্তবে সে-ই তওহীদপন্থী, যে সত্যিকার এক ছাড়া অন্য কাউকে দেখে না এবং অন্তর অন্য দিকে ফেরায় না। এ তওহীদ হচ্ছে এ আদেশ পালন করা ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

"বল, আল্লাহ। এরপর তাদেরকে তাদের বৃথা কথনে খেলাধুলা করতে দাও।"

এখানে মুখে বলা অর্থ নয়। কেননা, মুখ অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করে, যা কখনও সত্য কখনও মিথ্যা হয়। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার স্থান হচ্ছে অন্তর, যা তওহীদের উৎস।

চতুর্থ শব্দ যিকির ও তাযকীর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ

করেন ঃ وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

যিকিরের মজলিসের প্রশংসায় অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন–

اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قیل وما ریاض الجنة قال مجالس الذکر ۔

যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন বিচরণ কর, (অর্থাৎ, সংগ্রহ করে বেড়াও)। জিজ্ঞেস করা হল ঃ জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন ঃ যিকিরের মজলিস।

ان الله وملائكة سياحين فى الهواء سوى ملائكة الخلق اذا راوا مجالس الذكر ينادى بعضهم بعضا الا هلموا الى بغيتكم فياتونهم ويحفون بهم ويستمعون الا فاذكروا الله وكروا بانفسكم ۔

"মখলুকের ফেরেশতা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার কতক ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছে, তারা শূন্যে বিচরণ করে। তারা যখন যিকিরের মজলিস দেখে তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ চল, তোমাদের অভীষ্ট বিষয় এখানে রয়েছে। অতঃপর তারা যিকিরওয়ালাদের কাছে এসে তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং যিকির শুনে। সাবধান, আল্লাহর যিকির কর এবং নফ্সকে উপদেশ দাও।"

লোকেরা এ যিকির পরিবর্তন করে এমন সব বিষয়ের নাম যিকির রেখে দিয়েছে যা আজকালকার ওয়ায়েযরা সব সময় বর্ণনা করে। অর্থাৎ, কিসসা, কবিতা ইত্যাদির বর্ণনা। অথচ কিসসা বেদআত। পূর্ববর্তী মনীষীগণ কিসসা কথকের কাছে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে কিসসা ছিল না– হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ছিল। ফলে ফেতনা দেখা দেয় এবং কিসসা কথকরা বহিষ্কৃত হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে বললেন ঃ কিসসা কথকই আমাকে মসজিদ থেকে বের করেছে। সে না আসলে আমি বের হতাম না। যমরা বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে বললাম ঃ আমরা কিসসা কথকের কাছে যাব? তিনি বললেন ঃ বেদআতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও। ইবনে আওন বলেন ঃ আমি ইবনে সিরীনের কাছে গিয়ে আরজ করলাম ঃ আজ তেমন ভাল কাজ হয়নি। আমীর কিসসা কথকদের কিসসা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমীর উত্তম তওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন।

আ'মাশ (রহঃ) বসরার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি ওয়ায করছে এবং বলছে ঃ আ'মাশ আমার কাছে রেওয়ায়েত করেছেন। একথা শুনে আ'মাশ বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং বগলের লোম উপড়াতে লাগলেন। ওয়ায়েয বলল ঃ মিয়া, তোমার লজ্জা করে না। আ'মাশ বললেন ঃ আমি তো সুন্নত কাজ করছি। এতে শরমের কি আছে? বরং তুমি মিথ্য বলছ যে, আ'মাশ তোমার কাছে রেওয়ায়েত করেছে। শুন, আমিই আ'মাশ। আমি তোমার কাছে কিছুই রেওয়ায়েত করিনি। আহমদ বলেন ঃ কিসসা কথক ও ভিক্ষুক সর্বাধিক মিথ্যুক। হযরত আলী (রাঃ) বসরার জামে মসজিদ থেকে কিসসা কথককে বের করে দেন এবং হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা শুনলেন– তাঁকে বের করেননি। কারণ, তিনি আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, নফসের দোষ ও বিপজ্জনক আমল সম্পর্কে হুশিয়ার করতেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি আল্লাহ্র নেয়ামত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বান্দার অক্ষমতার কথা বলতেন এবং দুনিয়ার নিকৃষ্টতা, দোষ, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকালের পথে বিপদাপদের অবস্থা বর্ণনা করতেন। এটাই শরীয়তসম্মত উৎকৃষ্ট যিকির। এর প্রতিই আবু যর (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

"যিকিরের মজলিসে উপস্থিতি হাজার রাকআত (নফল নামায) পড়ার চেয়ে উত্তম। এলেমের মজলিসে যাওয়া হাজার রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করার চেয়ে এবং হাজার জানাযার পশ্চাতে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, কোরআন তেলাওয়াতের চেয়েও কি? তিনি বললেন ঃ কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা এটি এলেম বলেই।"

আতা (রঃ) বলেন ঃ যিকিরের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

এখন মিষ্ট ও মসলাযুক্ত কথার উদগাতারা তাদের বাজে কথাবার্তার নাম দিয়েছে তাযকীর। অথচ তারা উৎকৃষ্ট যিকিরের পথ ভুলে কোরআন বহির্ভূত ও অতিরঞ্জিত কিসসা কাহিনীতে ব্যাপৃত। একান্ত সত্য হলেও কতক কিস্সা শোনা উপকারী এবং কতক শোনা অপকারী হয়ে থাকে। যেব্যক্তি এটা অবলম্বন করে, তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী অপকারী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ হয়ে যায়। এ কারণেই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন ঃ সত্য অবস্থা বর্ণনাকারীর বড় প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যদি সে কিসসা কোন নবীর হয়, ধর্ম সম্পর্কিত হয় এবং কথকও সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কিস্সা শুনতে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্ণনাকারীর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যেসব কিসসায় এমন ত্রুটি ও অসতর্কতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, সেগুলো বর্ণনা করবে না এবং এমন বিরল ত্রুটি-বিচ্যুতিও বর্ণনা করবে না, যার পেছনে ত্রুটিকারী অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, যার ফলে সে ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য হয়ে গেছে। কিসসা কথক এ দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকলে তার কিসসা কথনে দোষ নেই। এসব শর্তসহ উৎকৃষ্ট কিসসা তাই হবে, যা কোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন লোক আনুগত্য ও এবাদতে উৎসাহ যোগায় এমন গল্প রচনা করে নেয়া দুরস্ত মনে করে। তারা বলে ঃ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। কিন্তু এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, সত্য ঘটনার অভাব নেই যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সত্ত্বেও ওয়াযে নতুন বিষয় আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা মকরূহ ও বানোয়াট গণ্য হয়েছে। সেমতে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ছেলে ওমর প্রয়োজনবশতঃ তাঁর কাছে আসেন। তিনি ওমরকে ছন্দপূর্ণ কাব্যে নিজের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে শুনে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তোমাকে মন্দ মনে করি। তওবা না করা পর্যন্ত আমি তোমার প্রয়োজনের কথা শুনব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার মুখে তিনটি ছন্দপূর্ণ বাক্য শুনে বললেন ঃ হে ইবনে রাওয়াহা! নিজেকে ছন্দের বাঁধন

থেকে দূরে রাখ। এ থেকে জানা যায়, যে ছন্দ দু'বাক্যের অধিক হয়, তা নিষিদ্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি ভ্রূণহত্যায় হত্যার বিনিময় সম্পর্কে বলেছিল ঃ

كيف ندى من لاشرب ولا اكل ولاصاح ولا استهل
ومثل ذلك بطل -

"যে খায়নি, পান করেনি, চিৎকার করেনি, তার রক্তপণ আমরা কিরূপে দেব? এরূপ বিষয় তো মাফ হয়ে যায়।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ বেদুঈন ব্যক্তির ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা কর।

ওয়াযের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কবিতা বলা খারাপ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالشُّعَرَاۤءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ -

"পথভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। দেখ না, তারা প্রতি উপত্যকায় মাথা কুটে ফেরে?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهٗ

আমি পয়গম্বরকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়।

যেসব কবিতা বলা ওয়ায়েযদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের মধ্যে এশকের জ্বালা, মাশুকের সৌন্দর্য, মিলনের আনন্দ ও বিরহের যন্ত্রণা বর্ণিত হয়। অথচ ওয়াযের মজলিস সর্বসাধারণ দ্বারাই পূর্ণ থাকে, যাদের অভ্যন্তর কামভাবে পরিপূর্ণ এবং অন্তর সুন্দর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট। এমতাবস্থায় এসব কবিতা তাদের মনের সুপ্ত বিষয়কে উস্কানি দেয়। ফলে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারা চিৎকার ও হাহুতাশ করে। মোট কথা, অধিকাংশ অথবা সব কবিতার পরিণতিই এক ধরনের অনিষ্টকর বিষয় হয়ে থাকে। তবে যেসব কবিতায় উপদেশ ও প্রজ্ঞা রয়েছে, কেবল সেগুলোই দলীল হিসাবে উল্লেখ করা এবং অন্য কোন প্রকার কবিতা ব্যবহার না করা উচিত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ان من الشعر لحكمة নিশ্চয় কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

যদি মজলিসে বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিবর্গ সমবেত থাকে এবং জানা থাকে যে, তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত, তবে তাদের জন্যে সে কবিতা ক্ষতিকর নয়, যা বাহ্যতঃ মানুষের উদ্দেশে রচনা করা হয়েছে। কেননা, শ্রোতা যা শুনে তা সে ছাঁচেই গড়ে নেয়, যা তার অন্তরে প্রবল থাকে। 'সেমা' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ কারণেই হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) ছয় থেকে দশ জন লোকের মধ্যে ওয়ায করতেন। এর বেশী হলে কিছুই বলতেন না। তাঁর মজলিসে কখনও পূর্ণ বিশ জন লোক হয়নি। একবার ইবনে সালেমের ঘরের দরজায় কিছু লোক সমবেত হলে এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)-কে বলল ঃ আপনি বয়ান করুন। এখানে আপনার বন্ধুবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এরা আমার বন্ধু নয়। এরা মজলিসের লোক। আমার বন্ধু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কতক সূফী দু'প্রকার কালাম গড়েছেন– একে তো তারা খোদায়ী এশ্ক ও মিলনের ব্যাপারে লম্বা চওড়া দাবী, যার পর বাহ্যিক আমলের কোন প্রয়োজন থাকেনি। এমনকি কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এক হয়ে যাওয়ার দাবীও করতে থাকে এবং বলে ঃ পর্দা সরে গেছে, দীদার হচ্ছে এবং সামনাসামনি সম্বোধন অর্জিত হচ্ছে। তারা আরও বলে ঃ আমাদের প্রতি এই আদেশ হয়েছে এবং আমরা এই বলেছি। এ ব্যাপারে তারা হুসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজের অনুরূপ হওয়ার দাবী করে, যাকে এমনি ধরনের কয়েকটি কথা বলার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তারা 'আনাল হক' উক্তি এবং হযরত বায়েযীদ বোস্তামীর উক্তিকে সনদ হিসাবে পেশ করে। অর্থাৎ, বায়েযীদ বোস্তামী থেকেও 'সোবহানী, সোবহানী বলার কথা বর্ণিত আছে।

এ ধরনের বাক্যের দ্বারা সর্বসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমন কি, কোন কোন কৃষক তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমনি ধরনের দাবী করতে শুরু করে। কেননা, এ বাক্য অন্তরের কাছে খুব ভাল মনে হয়। এতে বাহ্যিক আমল করতে হয় না। মকাম ও হাল অর্জনের জন্যে

আত্মশুদ্ধিও করতে হয় না। কাজেই নির্বোধেরা এরূপ দাবী করবে না কেন এবং পাগলামি ও বাজে কথা বকবে না কেন? কেউ তাদের এ সব বিষয় মানতে অস্বীকার করলে তারা বলে ঃ এ অস্বীকারের কারণ হচ্ছে এলেম ও বিতর্ক। এলেম একটি পর্দা এবং বিতর্ক নফসের আমল। আমরা যা অর্জন করেছি তা নূরের কাশফের মাধ্যমে কেবল বাতেন দ্বারা জানা যায়। মোট কথা, এমনি ধরনের বিষয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সর্বসাধারণের ক্ষতি এত বেড়ে গেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কিছু কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলা দশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখার তুলনায় ভাল হয়।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী থেকে বর্ণিত উক্তি সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমতঃ এর বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ এরূপ কথা তাঁর মুখে শুনে থাকে, তবে সম্ভবতঃ আল্লাহ্র উক্তিকেই বর্ণনার আকারে তিনি মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। যেমন বলতেন ঃ

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ -

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার এবাদত কর।" (সূরা তোয়াহা)

এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, যিনি এ আয়াত পাঠ করছেন তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন।

দ্বিতীয় প্রকার কালাম যা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটি বাহ্যতঃ ভাল কিন্তু অর্থ ভয়াবহ। এতে কোন প্রকার উপকার হয় না। এসব কালাম স্বয়ং বক্তারই হৃদয়ঙ্গম হয় না; বরং পাগলামি ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার কারণে বলে দেয়। এ পাগলামির কারণ, যে কথা তার কানে পড়ে, তার অর্থ কমই স্মরণ রাখে। অধিকাংশ এরূপই।

অথবা বক্তা নিজে বুঝে কিন্তু অপরকে সে কালাম বুঝাতে পারে না। কিংবা মনের ভাব প্রকাশ করার মত বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, বিদ্যাবুদ্ধি কম। এ ধরনের কালাম দ্বারা অন্তর পেরেশান এবং বুদ্ধি চিন্তাকে হয়রান করা ছাড়া কোন উপকার হয় না। হাঁ, এমন অর্থ বুঝে নেয়া যেতে পারে, যা উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এসব কালামের অর্থ নিজের বাসনা অনুযায়ী বুঝবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যার অর্থ তারা বুঝে না, সে হাদীস সেই সম্প্রদায়ের জন্যে একটি আপদ হবে। তিনি আরও বলেন ঃ এমন কথা বল, যা তারা বুঝে। যা বুঝে না তা বলো না। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হোক? এ উক্তিটি এমন কালাম সম্পর্কে, যার বক্তা নিজে তা বুঝে বটে কিন্তু শ্রোতারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এরূপ কালাম বলা জায়েয হবে না। এ থেকে জানা যায়, যে কালাম স্বয়ং বক্তাই বুঝে না, তা বলা কেমন করে দুরস্ত হবে?

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যারা যোগ্য নয়, তাদেরকে জ্ঞানের কথা শুনিয়ো না। শুনালে জ্ঞানের কথার প্রতি তোমার বাড়াবাড়ি হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য, তাদের থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রেখো না। রাখলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কোমলপ্রাণ চিকিৎসকের মত হয়ে যাও। সে যেখানে রোগ দেখে সেখানেই ওষুধ লাগিয়ে দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি অযোগ্যদের মধ্যে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে, সে মূর্খ। আর যে যোগ্য থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রাখে সে জালেম। জ্ঞানের কথা একটি প্রাপ্য হক। কিছু লোক এর অধিকারী। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দেয়া উচিত।

কেউ কেউ শরীয়তের বাহ্যিক শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা গ্রহণ করে না এবং তা থেকে এমন বাতেনী বিষয় উদ্ভাবন করে, যার কোন উপকারিতা নেই। যেমন, বাতেনী ফের্কার লোকেরা কোরআন মজীদের ভিন্ন অর্থ বের করে। এটাও হারাম এবং এর ক্ষতি অনেক বেশী। কেননা, শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন দলীল ও প্রয়োজন ছাড়াই যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দের উপর কোন আস্থা থাকবে না। ফলে আল্লাহ ও রসূলের কালামের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সকলের বাতেন এক রকম হয় না। তাতে পরস্পর বিরোধিতার আশংকা থাকে। ফলে শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ঢেলে নেয়া যেতে পারে। বাতেনী ফের্কা এভাবে গোটা শরীয়তকে বরবাদ করেছে। এ ফের্কার লোকেরা কোরআনের যে ব্যাখ্যা করে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ اذ هب الى فرعون انه طغى (হে মূসা!) ফেরআউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এতে অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরআউনের অর্থও

অন্তর। অন্তরই প্রত্যেক মানুষের অবাধ্য। وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' -বাতেনী ফের্কা বলে ঃ আল্লাহ ব্যতীত যেসব বস্তুর উপর ভরসা করা হয়, সেগুলো নিক্ষেপ করা উচিত। হাদীসে আছে تسحروا فان فى السحور بركة "তোমরা সেহরী খাও। সেহরীর মধ্যে বরকত আছে।" বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এর অর্থ সেহরীর সময় এস্তেগফার করা। তারা এমনিভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা আদ্যোপান্ত কোরআনকে বাহ্যিক অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য আলেমগণ কর্তৃক বর্ণিত তফসীর থেকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক যে বাতিল তা নিশ্চিত। যেমন ফেরআউনের অর্থ অন্তর নেয়া। কেননা, ফেরআউন একজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি ছিল। সে কাফের ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন- একথা আমাদের জানা। এমনিভাবে সেহ্‌র শব্দ দ্বারা এস্তেগফার অর্থ নেয়াও বাতিল। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন আহার করতেন এবং বলতেন ঃ

هلموا الى الغذاء المبارك অর্থাৎ, তোমরা বরকতের খাদ্যের দিকে এসো। মোট কথা, এসব ব্যাখ্যা হারাম ও পথভ্রষ্টতা। এগুলোর মধ্যে কোনটিই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত নেই। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)- যিনি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান ও উপদেশদানে পাগলপারা ছিলেন, তাঁর পক্ষ থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত নেই। হাদীসে আছে-

من فسر القران برآيه فليتبوا مقعده من النار.

যেব্যক্তি নিজের মতানুযায়ী কোরআনের তফসীর করে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।

এ হাদীসে উপরোক্তরূপ বাক্যই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে একটি উদ্দেশ্য ও মত ঠিক করে নিয়ে সেই মত প্রমাণ করার জন্যে কোরআনকে সাক্ষী করা এবং কোরআনের শব্দ থেকে আপন মতলব উদ্ধার করা। অথচ এর পেছনে কোন আভিধানিক সমর্থন নেই।

এ হাদীস থেকে একথা বুঝা ঠিক হবে না যে, চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কোরআনের তফসীর করা যাবে না। কেননা, অনেক আয়াত সম্পর্কে সাহাবী ও তফসীরকারগণের পক্ষ থেকে পাঁচ ছয় ও সাত ধরনের

উক্তি বর্ণিত আছে। এটা জানা কথা, সবগুলো উক্তিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত নয়। কেননা, এসব উক্তি মাঝে মাঝে পরস্পর বিরোধীও হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূতই হয়ে থাকবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ اللهم فقهه فى الدين হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন।

যারা উপরোক্তরূপ অপব্যাখ্যা বৈধ মনে করে এবং বলে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, তারা সে ব্যক্তিরই অনুরূপ, যে শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন একটি বাস্তব সত্য বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীস গড়ে নেয় অথবা যে কোন বিষয় সে সত্য মনে করে, সে সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস তৈরী করে নেয়। এটা জুলুম ও গোমরাহী এবং নিম্নবর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত–

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ـ

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।' বরং শব্দের অপব্যাখ্যা করা আরও খারাপ। কেননা, এর কারণে শব্দের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং কোরআন বুঝার পথ রুদ্ধ হয়। এখন তুমি জেনে থাকবে যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছাকে কিরূপ সৎ জ্ঞান থেকে সরিয়ে মন্দ জ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছে। এগুলো মন্দ আলেমদের দ্বারা মর্মার্থ পরিবর্তনের বদৌলত প্রসার লাভ করেছে। যদি তুমি কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে তাদের অনুসরণ কর এবং প্রথম যুগে যেসকল ব্যাখ্যা সুবিদিত ছিল, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না কর, তবে তোমার অবস্থাও শোচনীয় হবে।

পঞ্চম শব্দ হেকমত। আজকাল হাকীম শব্দটি চিকিৎসক, কবি ও জ্যোতির্বিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বরং যেব্যক্তি ফুটপাতে বসে নানা রূপ ভেল্কী দেখায়,, তাকেও হাকীম বলা হয়। অথচ হেকমতের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ـ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। যে হেকমত প্রাপ্ত হয় সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ মানুষ যদি হেকমতের একটি বাক্য শেখে, তবে এটা তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এখন চিন্তা কর, পূর্বে হেকমত কি ছিল আর এখন কার্যতঃ কোন্ অর্থে চলে গেছে। অন্যান্য শব্দ এর উপরই অনুমান করে নাও এবং মন্দ আলেমদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, দ্বীনের উপর তাদের অনিষ্ট শয়তানদের তুলনায় অনেক বেশী। শয়তান তাদের মাধ্যমেই মানুষের মন থেকে দ্বীনকে বহিষ্কার করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ঘৃণ্যতম মানুষ কে? তিনি জওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ ইলাহী! ক্ষমা কর। অতঃপর বার বার জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বললেন ঃ ঘৃণ্যতম মানুষ হচ্ছে মন্দ আলেম। সুতরাং ভাল ও মন্দ এলেম জানা হয়ে গেছে এবং আরও জানা হয়েছে যে, কি কারণে ভাল এলেম মন্দ এলেমের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখন তুমি ইচ্ছা করলে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণ করবে। আর যদি প্রতারণার কূপে নিক্ষিপ্ত হতে চাও, তবে পরবর্তীদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। যেসব জ্ঞান পূর্ববর্তীদের পছন্দনীয় ছিল সেগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে এলেমের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার অধিকাংশই বেদআত বা নতুন আবিষ্কার। রসূলে করীম (সাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

بدآ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدآ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء ـ قال الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتى والذين يحيون ما اماتوه من سنتى ـ

"ইসলামের সূচনা হয়েছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই ফিরে যাবে যেমন সূচনা হয়েছিল। অতএব সুসংবাদ একাকীদের জন্যে। প্রশ্ন করা হল ঃ একাকী কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার সেই সুন্নতের সংস্কার করে, যা মানুষের হাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং যারা সেই সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে, যাকে মানুষ মেরে ফেলে।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা আজ যে বিষয় আঁকড়ে রয়েছ, তারা সে বিষয় আঁকড়ে থাকবে। অন্য হাদীসে আছে– তারা অনেক লোকের মধ্যে কম সংখ্যক সৎলোক। তাদের বন্ধুর তুলনায় শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। কেউ এ জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করলে মানুষ তার শত্রু হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন আলেমের অনেক বন্ধু দেখ, তখন বুঝে নাও সে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে কেবল সত্য কথা বললে অধিকাংশ মানুষ তার শত্রু হত।

কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান

প্রকাশ থাকে যে, এদিক দিয়ে জ্ঞান তিন প্রকার– এক, যে জ্ঞানের অল্পও মন্দ, অধিকও মন্দ। দুই, যে জ্ঞানের অল্পও ভাল, অধিকও ভাল এবং তিন, যে জ্ঞান যতটুকুতে কাজ চলে, ততটুকু হলে তো ভাল, কিন্তু চাহিদার অতিরিক্ত হলে প্রশংসনীয় নয়। এ প্রকার তিনটি দেহের অবস্থার মতই। দেহের কোন কোন অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন সুস্থতা ও সৌন্দর্য। কতক অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, মন্দ বিবেচিত হয়; যেমন কুশ্রী হওয়া ও কুচরিত্র হওয়া। কতক অবস্থা এমন যে, তা মাঝামাঝি পরিমাণে হলে ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন অর্থ ব্যয়। এ ব্যাপারে অপব্যয় প্রশংসনীয় নয়, যদিও তা ব্যয়। প্রথম প্রকার জ্ঞান যার অল্প ও অধিক সবটাই মন্দ তা হল এমন জ্ঞান যাতে ইহকাল ও পরকালের কোন উপকারিতা নেই, অথবা যার ক্ষতি উপকারিতার তুলনায় বেশী। যেমন জাদু, তেলেসমাত ও জ্যোতির্বিদ্যা। এগুলোর কোনটির মধ্যেই ফায়দা নেই। মানুষের উৎকৃষ্ট সম্পদ জীবন এতে ব্যয় করা অনর্থক বরবাদ করার নামান্তর। আবার কোন জ্ঞানের দ্বারা পার্থিব কোন প্রয়োজন কখনো মিটে গেলেও এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হয়ে থাকে; বরং অপকারের তুলনায় এ উপকার তুচ্ছ মনে হয়। আর যে জ্ঞান আদ্যোপান্ত ভাল, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফত, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অভ্যাস ও নীতি জানা এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার রহস্য অবগত হওয়া। এ জ্ঞানই মূল উদ্দেশ্য এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের উপায়। এ জ্ঞানার্জনের যত বেশী চেষ্টাই করা হোক তা প্রয়োজনের

তুলনায় কমই হবে। কেননা, এটা অতল দরিয়া। সকল পর্যটক তার তীরেই ঘুরাফেরা করে। এর অভ্যন্তরে নবী, ওলী ও দৃঢ় চিত্ত আলেম ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে এলেম শিক্ষা করা ও আখেরাত শাস্ত্রজ্ঞগণের জীবনী অধ্যয়ন করা কল্যাণকর হয়ে থাকে, এটা শুরুতে দরকার। পরিণামে এ শিক্ষায় যে বিষয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাধনা, অধ্যবসায়, অন্তরের পরিশুদ্ধি, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকরণ এবং দুনিয়াতে নবী ওলীদের মিল সৃষ্টিকরণ। যে কেউ এ জ্ঞান লাভের জন্যে এভাবে চেষ্টা করবে, সে তার ভাগ্যে যতটুকু আছে তা পেয়ে যাবে। চেষ্টা পরিমাণে পাবে না। হাঁ, এতে সাধনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। সাধনা ব্যতীত কোন কিছু অর্জিত হয় না। এ ছাড়া হেদায়েতের কোন চাবি নেই।

তৃতীয় শিক্ষা (যা এক বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত ভাল)– সে শিক্ষা, যা আমরা ফরযে কেফায়ার বর্ণনায় লিখে এসেছি। মানুষের উচিত দু'টি বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করা। হয় সে নিজের চিন্তা করবে এবং নিজের চিন্তা শেষ হলে অপরের চিন্তা করবে। কিন্তু নিজের সংশোধন করার পূর্বে অপরের সংশোধনে মশগুল হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এখন যদি তুমি নিজের চিন্তা কর, তবে সর্বপ্রথম সে জ্ঞান আহরণে মশগুল হও, যা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তোমার উপর ফরযে আইন। আর বাহ্যিক আমল যেমন নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে মশগুল হও। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান মানুষ বাদ দিয়ে রেখেছে, সেটি হচ্ছে অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে জানতে হবে, কোন্ গুণটি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ। কেননা, কোন মানুষ এমন নেই যার মধ্যে লোভ, লালসা, হিংসা, রিয়া ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী নেই। এগুলো সবই মারাত্মক গুণ। এগুলোকে এমনিই রেখে কেবল বাহ্যিক আমলে মশগুল থাকা এমন, যেমন কেউ খোস-পাঁচড়া, ফোড়া ইত্যাদি রোগে কেবল ত্বকের উপর প্রলেপ দেয় এবং শিঙ্গা লাগিয়ে ভিতরের বদরক্ত বের করার ব্যাপারে অলসতা করে। যারা নামেই আলেম এবং কাঠমোল্লা, তারা কেবল বাহ্যিক আমল সম্পর্কেই বর্ণনা করে। আর আখেরাতের আলেমগণ বাতেনের সংস্কার ও অনিষ্টের উপকরণ দূর করা ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অধিকাংশ মানুষ কেবল বাহ্যিক আমল করে এবং অন্তর পরিষ্কার করে না। এর কারণ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল

সহজ এবং অন্তরের আমল কঠিন। এটা এমন, যেমন কেউ তিক্ত ও বিস্বাদ ওষুধ পান করা কঠিন মনে করে কেবল ত্বকের উপর ওষুধের প্রলেপ লাগায়। সে এতেই লিপ্ত থাকে এবং ভিতরে বদ উপকরণ বৃদ্ধি পেয়ে রোগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং তুমি যদি আখেরাত কামনা কর এবং চির ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি প্রত্যাশা কর, তবে বাতেনের রোগ ও তার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ কর। তৃতীয় খন্ডে আমরা এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। সেটা জানার পর তুমি সে উৎকৃষ্ট মকামে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে যা আমরা চতুর্থ খন্ডে বর্ণনা করেছি। কেননা, অন্তর মন্দ বিষয় থেকে মুক্ত হলে তাতে ভাল বিষয়ের জন্য স্থান সংকুলান হয়। ফরযে আইন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ফরযে কেফায়াতে ব্যাপৃত হয়ো না। বিশেষতঃ যখন অন্যেরা তা জানে ও পালন করে। কেননা, যেব্যক্তি অন্যের সম্ভাব্য সংশোধনের আশায় নিজের জীবন বিপন্ন করে, সে নির্বোধ। উদাহরণতঃ কারও কাপড়ের মধ্যে সাপ বিচ্ছু ঢুকে পড়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত, কিন্তু সে অপরের শরীর থেকে মাছি তাড়ানোর জন্যে পাখা খুঁজে ফিরে। এ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হবে? যদি তুমি তোমার জাহের ও বাতেনের গোনাহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হও এবং এটা তোমার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়, যা মোটেই অসম্ভব নয়, তবে তখন অবশ্য ফরযে কেফায়ায় মশগুল হতে পার। এতে ধারাবাহিকতা ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থাৎ, প্রথমে কালামে মজীদ, এর পর হাদীস শরীফ, অতঃপর তফসীর এবং কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে হাদীসের শিক্ষা ও তার শাখা-প্রশাখায় মশগুল হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ফেকাহ শাস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য মাযহাবসমূহ জানতে হবে– মতভেদ নয়। এর পর ফেকাহর নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা জীবনে যতদূর সম্ভব অর্জন করা কর্তব্য। কিন্তু সমগ্র জীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশে ডুবিয়ে রাখা অনুচিত। কেননা, জ্ঞান সীমাহীন এবং বয়স সীমিত।

এসব শাস্ত্র অন্য উদ্দেশ্যের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়, স্বয়ং কাম্য নয়। কাজেই এগুলোতে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া ঠিক নয় যে, আসল উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে যায়। কাজেই অভিধান শাস্ত্র ততটুকুই শিক্ষা করা উচিত, যদ্দ্বারা আরবী ভাষা বুঝা ও বলা যায়। এমনিভাবে ব্যাকরণ ততটুকু শিক্ষা করা দরকার, যতটুকুর সম্পর্ক কোরআন ও হাদীসের সাথে

রয়েছে। শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে– (১) যতটুকুতে কাজ চলে, (২) মাঝারি স্তর এবং (৩) পূর্ণতার স্তর। 'এখন হাদীস, তফসীর, ফেকাহ ও কালাম শাস্ত্রের এ তিনটি স্তর বলে দেয়া হচ্ছে, যাতে অন্যান্য শাস্ত্রও অনুমান করে নেয়া যায়। তফসীর শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে কোরআনের দ্বিগুণ পুরু একটি কিতাব যেমন, আলী ওয়াহেদী নিশাপুরীর তফসীর ওজীয। মাঝারি স্তর হচ্ছে কোরআনের তিন গুণ পুরু একটি কিতাব। যেমন, নিশাপুরীর অন্য তফসীর ওসীত। পূর্ণতার স্তর আরও বেশী, যার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসের প্রথম স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের বিষয়বস্তু কোন পন্ডিত ব্যক্তির কাছে বুঝে নেয়া। বর্ণনাকারীদের নাম মুখস্থ করা জরুরী নয়। এ কাজ পূর্ববর্তী লোকেরা সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের কিতাবসমূহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। মাঝারি স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের সাথে সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঠ করা। পূর্ণতার স্তর হচ্ছে দুর্বল, শক্তিশালী, সহীহ, মুয়াল্লাল ইত্যাদি যত প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে সবগুলো পাঠ করা এবং সনদের অনেক তরীকা, বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত, নাম ও গুণাবলী জানা। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে মুযানীর মুখতাসারের ন্যায় কিতাব পড়ে নেয়া। মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার কিতাব ওসীতের সাথে আরও বড় বড় কিতাব পাঠ করা। কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত আহলে সুন্নতের আকীদাসমূহ জেনে নেয়া। এর মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল এতেকাদের' মত একশ' পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। বেদআতীদের সাথে বিতর্ক করার জন্যেই কালামশাস্ত্রের প্রয়োজন। এটা কেবল সর্বসাধারণের স্বার্থেই উপকারী। বেদআতী ব্যক্তি সামান্য বিতর্ক জানলেও তার সাথে কালাম শাস্ত্র কমই উপকারী হয়। কারণ, বিতর্কে নিরুত্তর হয়ে গেলেও সে বেদআত ত্যাগ করবে না। সে নিজেকে অপক্ক মনে করে ধরে নেবে, এর জওয়াব অবশ্যই আছে, তবে আমি দিতে পারিনি।

মন্দ আলেমদের দোষ এই যে, তারা সত্যের নামে বিদ্বেষে বাড়াবাড়ি করে এবং প্রতিপক্ষকে ঘৃণার চোখে দেখে। এর ফল এই দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষও মোকাবিলা করতে উদ্যত হয় এবং বাতিলের পক্ষপাতিত্ব অধিক করে। যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয় তা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। যদি আলেমগণ শুভেচ্ছা ও হিতাকাঙ্ক্ষার পথ ধরে একান্তে

প্রতিপক্ষকে উপদেশ দিত এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করত, তবে সম্ভবতঃ সফলতা অর্জিত হত।

পরবর্তী যমানায় যেসব বিরোধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে ধরনের রচনা, গ্রন্থ ও বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমন পূর্ববর্তী যমানায় ছিল না। এগুলো থেকে মারাত্মক বিষের ন্যায় বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধিই ফেকাহবিদদেরকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত করেছে। আমার বক্তব্য তেমনি কোন ফেকাহবিদ শুনলে বলবে ঃ যে যা না পারে, সে তার দুশমন হয়ে যায়। এতে তোমার বুঝা উচিত নয় যে, আমি এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; বরং আমি এ শাস্ত্রে জীবনের একটি বড় অংশ নিয়োজিত করেছি। রচনা, তথ্যানুসন্ধান, বিতর্ক ও বর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকেও পেছনে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু এর পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সরল পথ এলহাম করে এ শাস্ত্রের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন আমি এ শাস্ত্র বর্জন করে আত্মচিন্তায় মশগুল হয়েছি। কাজেই আমার উপদেশ তোমার কবুল করা উচিত। কেননা, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ঠিক হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে, ফতোয়া শরীয়তের স্তম্ভ এবং শরীয়তের কারণসমূহ বিরোধ না জেনে জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা জরুরী। এ যুক্তি শুনে তোমার পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, মাযহাবের কারণসমূহ স্বয়ং মযহাবে উল্লিখিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত সবই অহেতুক ঝগড়া। প্রথম যুগের লোকগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো জানতেন না। অথচ অন্যদের তুলনায় তাঁরা ফতোয়া শাস্ত্র অনেক বেশীই জানতেন।

অতএব তোমার উচিত জ্বিন শয়তানদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মানব শয়তানদের ধোঁকা থেকেও বেঁচে থাকা। মানব শয়তানরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত করার কাজে জ্বিন শয়তানদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছে।

সারকথা, তুমি পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে একাকী ধরে নাও এবং জান যে, মৃত্যু, আল্লাহর সামনে উপস্থিতি, হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখ সম্মুখে রয়েছে। এর পর চিন্তা কর, এই সামনের বস্তুগুলোর মধ্যে কোন্‌টি তোমার জন্যে উপকারী। যেটি উপকারী সেটি অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট সবগুলো বর্জন কর।

জনৈক সূফী কোন একজন পরলোকগত আলেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যেসব শাস্ত্র দ্বারা বিতর্ক করতেন, সেগুলোর অবস্থা কি? আলেম ব্যক্তি তার প্রসারিত হাতের তালুতে ফুঁ মেরে বললেন ঃ সব ধুলোর ন্যায় উড়ে গেছে। কেবল দু'রাকআত নামায আমার কাজে এসেছে, যা রাতের বেলায় আমি আদায় করতাম। হাদীসে বলা হয়েছে–

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اوتوا الجدل ثم قرآ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون -

"হেদায়াত লাভ করার পর কোন সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখন হয়েছে, যখন তারা কলহ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ তারা কেবল কলহের জন্যেই আপনার এ নাম বর্ণনা করে। তারা তো কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।"

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ (যাদের অন্তর বক্র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে আছে– এরা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক এবং وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ –এদের থেকে বেঁচে থাকুন, যাতে ওরা আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে– আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক হবে, যাদের উপর আমলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঝগড়া ও বিতর্কের দরজা খুলে যাবে। এক হাদীসে আছে– তোমরা এমন যমানায় আছ, যাতে আমলের দরজা খোলা আছে। অচিরেই এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যাদের অন্তরে বিবাদ ঢেলে দেয়া হবে। মশহুর এক হাদীসে আছে– ابغض الخلق الى الله تعالى الالد الخصم আল্লাহ তা'আলার কাছে মানুষের মধ্যে অধিক নিন্দনীয় হচ্ছে ঝগড়াটে ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যে সম্প্রদায় বাকপটুতা প্রাপ্ত হয়, তারা আমল থেকে বঞ্চিত হয়। আলী ইবনে বসীর হিম্মামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা খলীল ইবনে আহমদের মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন ঃ আপনার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান আমি কাউকে পাইনি। এখন আপনার অবস্থা কি? খলীল

বললেন ঃ আমি যে কাজে ব্যাপৃত ছিলাম তার অবস্থা তো তুমি জেনেছ? এ কলেমাগুলো ছাড়া কোন কিছু আমার জন্যে উপকারী হয়নি-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ -

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তর্কশাস্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা ছিলেন একাধারে আলেমবিল্লাহ (আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী), তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দানের ব্যাপারে পারদর্শী। এ কারণেই ফেকাহবিদদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন তাঁদের কমই হত। কেবল যেসব ব্যাপারে পরামর্শ ছাড়া উপায় ছিল না, সেগুলোতেই ফেকাহবিদদের প্রয়োজন দেখা দিত। এজন্যই আলেমগণ একনিষ্ঠভাবে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রেই নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁদের অন্য কোন বৃত্তি ছিল না। তাঁরা আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং এ নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন এবং এ দায়িত্ব একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। তাঁরা সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য থেকে এ কথাই জানা যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর আলেম যোগ্যতা এবং বিধি-বিধান ও ফতোয়া সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ছাড়াই শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে ফেকাহবিদদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং সর্বাস্থায় তাদেরকে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তাবেয়ী আলেমগণের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা প্রথম যুগের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত, খাঁটি দ্বীনের অনুসারী এবং পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন। ফলে শাসকবর্গ তাঁদেরকে ডাকলে তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন। তাই বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের বিভিন্ন পদ দান করার জন্যে শাসকবর্গ আলেমগণকে পীড়াপীড়ি করত। খলীফা, ইমাম ও প্রশাসন সবাই আলেমগণের তোয়াজ করতেন, কিন্তু আলেমগণ তাদের হাতে ধরা দিতেন না। সমসাময়িক লোকেরা যখন আলেমগণের এই সম্মান প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা এলেম হাসিল

করার প্রতি মনোনিবেশ করল, যাতে শাসকবর্গের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। তারা ফতোয়া শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেদেরকে শাসকবর্গের সামনে উপস্থাপন করল। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার লাভ করল।

কিছু সংখ্যক তো এর পরেও বঞ্চিত রইল এবং কিছু সংখ্যকের উদ্দেশ্য সফল হল। যারা সফল হল, তারাও চাওয়ার লাঞ্ছনা এবং অনাহূত অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়ার অবমাননা থেকে বাঁচতে পারল না। মোট কথা, যে ফেকাহবিদগণ পূর্বে প্রার্থিত ছিল, তারা এখন প্রার্থী হয়ে গেল। পূর্বে যারা শাসকবর্গের হাতে ধরা দিত না এবং সম্মানিত ছিল, এখন তাদের কাছে এসে তারা লাঞ্ছিত হল। কিন্তু এর পরেও যেসব আলেম তওফীকপ্রাপ্ত হলেন, তাঁরা সর্বদাই এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত রইলেন। সে যুগে মানুষের অধিকাংশ মনোযোগ ফতোয়া ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কেননা, পদ ও শাসনক্ষমতা লাভে এরই প্রয়োজন ছিল বেশী। তাদের পরে আকায়েদের রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষের আলোচনা শুনে কিছু সংখ্যক শাসকের মনে কারণসমূহের প্রমাণাদি শুনার আগ্রহ সৃষ্টি হল। জনসাধারণ যখন জানতে পারল, এই শাসকগণ কালাম শাস্ত্রের মোনাযারা ও বিতর্কের প্রতি আগ্রহী, তখন তারা এরই চর্চা শুরু করে দিল। এতে অনেক গ্রন্থ রচিত হল এবং বিতর্কের পদ্ধতি, প্রতিপক্ষের বক্তব্যে আপত্তি উত্থাপনের পন্থা আবিষ্কৃত হল। তারা মনে করল, আল্লাহর দ্বীনের পক্ষ থেকে মন্দ বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, সুন্নতের পক্ষ থেকে লড়াই করা এবং বেদআতের মূলোৎপাটন করাই আমাদের লক্ষ্য। যেমন- তাদের পূর্বসূরি ফেকাহবিদগণ বলতেন, তাদের উদ্দেশ্য ফতোয়া উত্তমরূপে জানা এবং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের দায়িত্ব নেয়া।

এর কিছুকাল পরে এমন শাসকশ্রেণী আগমন করল, যারা কালাম শাস্ত্রের গবেষণা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখল না। কারণ, এতে বিতর্কের দ্বার খুলে যাওয়ায় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমনকি, খুনাখুনি এবং জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারা ফেকাহ সম্পর্কিত মোনাযারা, বিশেষতঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রহঃ)-এর মাযহাবের উত্তম বিধান জানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। সেমতে জনসাধারণ কালাম শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র বাদ দিয়ে এই ইমামদ্বয়ের মধ্যে

বিরোধীয় মাসআলাসমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ইমাম মালেক, আহমদ ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মধ্যেকার মতভেদসমূহের প্রতি তারা তেমন কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেনি। তারা নিজেদের খামখেয়ালীতে একথা বুঝে নেয় যে, তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বের করা, দ্বীনের কারণসমূহ সপ্রমাণ করা এবং ফতোয়ার মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন করা। এ সম্পর্কে তারা অনেক গ্রন্থ রচনা করে, যাতে নানারকম বিতর্ক লিপিবদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ এখন পর্যন্ত এ নীতিই অনুসরণ করে আসছে। জানি না, আমাদের পরবর্তী যমানায় আল্লাহ তা'আলা কি অবধারিত করে রেখেছেন। মোট কথা, মতভেদ ও মোনাযারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এটাই ছিল কারণ। যদি শাসকশ্রেণী এগুলো ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়, তবে আলেমরাও তাদের অনুগামী হবে এবং এ বাহানা পেশ করা থেকে বিরত হবে না যে, যে শাস্ত্রে তারা মশগুল রয়েছে সেটা ধর্মীয় শাস্ত্র এবং আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য ছাড়া তাদের অন্য কিছু কাম্য নয়।

মোনাযারা

জানা উচিত, একশ্রেণীর আলেম কোন কোন সময় মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তাদের মোনাযারা বা বিতর্ক করার উদ্দেশ্য এমন বিষয়ে আলোচনা, যাতে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। কেননা সত্য কাম্য। চিন্তায় একে অন্যের সাহায্য করা এবং অনেক লোকের ঐকমত্য হওয়া নিঃসন্দেহে উপকারী। সাহাবায়ে কেরামও এ উদ্দেশেই পরস্পর পরামর্শ করতেন। উদাহরণতঃ তাঁরা দাদা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, মদ্যপানের শাস্তি, ফরায়েযের মাসআলা ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করতেন। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মুহাম্মদ, মালেক, আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ ইমাম থেকে বর্ণিত মতভেদও এ বিষয়ে সহায়ক। আমি তোমাকে এ বিভ্রান্তির অন্তর্নিহিত রহস্য বলে দিচ্ছি, সত্য বিষয়ে একে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই ধর্মসিদ্ধ। কিন্তু এর জন্যে কয়েকটি শর্ত ও আলামত রয়েছে।

প্রথম, মোনাযারা যেহেতু ফরযে কেফায়া। কাজেই যেব্যক্তি ফরযে আইন সমাপ্ত করেনি, তার পক্ষে এতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। যার উপর ফরযে আইন রয়েছে, সে যদি ফরযে কেফায়ায় ব্যাপৃত হয় এবং

বলে, তার উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ, তবে সে মিথ্যাবাদী। সে সে ব্যক্তিরই মত, যে নিজে নামায পড়ে না এবং বস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত থেকে বলে ঃ আমার উদ্দেশ্য যারা উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়ে এবং পোশাক পায় না, তাদের সতর আবৃত করা। কেননা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর এবং বাস্তবে কখনও এরূপ হয়েও থাকে। যেমন, ফেকাহবিদগণ বলেন, তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর, যদিও কম সংঘটিত হয়। আজ যারা মোনাযারায় ব্যাপৃত থাকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে ফরযে আইন বিষয়সমূহ বর্জন করে বসেছে। যদি কারও উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন আমানত আদায় করা ওয়াজেব হয়ে থাকে এবং সে তাতে অবহেলা করার বাহানারূপে নামায পড়তে থাকে, যা বাহ্যতঃ সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ, তবে বলাবাহুল্য, এ নামায দ্বারা সে আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানই হবে। এ থেকে জানা গেল, আনুগত্যের কোন কাজ করাই মানুষের আনুগত্যশীল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না তাতে সময়, শর্ত ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য রাখা হয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা অপেক্ষা অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ না দেখা। যদি অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এরপরও মোনাযারায় ব্যাপৃত হয়, তবে সে নাফরমান হবে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মানুষকে পিপাসায় কাতর হতে দেখে, কেউ যাদের খবর নেয় না। কিন্তু সে তাদেরকে পানি পান করাতে সক্ষম। এমতাবস্থায় সে পানি পান না করিয়ে যদি শিংগা লাগানোর কৌশল শিক্ষা করতে ব্যাপৃত হয় এবং বলে, এটা শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া; শহরে এরূপ কুশলী ব্যক্তি না থাকলে শহরবাসীরা রোগে কষ্ট পাবে। যদি তাকে কেউ বলে, শহরে শিংগা লাগানোর লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তবে সে বলে, এতে এ কাজটি যে ফরযে কেফায়া, তা তো বিলুপ্ত হয় না। মোট কথা, যেব্যক্তি এরূপ করে এবং নেহায়েত জরুরী কাজটি করে না, অর্থাৎ পিপাসার্ত মুসলমানদেরকে পানি পান করায় না, তার অবস্থা এ ব্যক্তির মতই, যে মোনাযারাকে ফরযে কেফায়া মনে করে তাতে ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য যেসব ফরযে কেফায়া কেউ পালন করে না, তাতে তৎপর হয় না। উদাহরণতঃ ফতোয়ার কথাই বলা যাক, এর জন্যে অনেক লোক রয়েছে। প্রত্যেক শহরে কিছু না কিছু